জনশিক্ষার কথা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, এম. এ বি. টি.
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এম. এস. সি.

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

পশ্চিমবাংলা গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যাশিক্ষার মান, প্রণালী ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি গড়েছিলেন। আমি সে কমিটির সভাপতি ছিলাম, এবং কমিটির সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ, দু-একজন ছিলেন নিরক্ষর বয়স্কশিক্ষার বিশেষজ্ঞ। শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন রায় ছিলেন এই কমিটির সেক্রেটারী। কমিটির কাজ সুসম্পন্ন করেই যে বয়স্কশিক্ষার আলোচনা তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি, এই ছোট পুঁথিখানি তার প্রমাণ। এই পুঁথিতে নিরক্ষর বা কেবলমাত্র সাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার গুটিকয়েক মূলকথার পরিষ্কার আলোচনা আছে। বর্তমান ভারতবর্ষের সব প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার বয়স্কশিক্ষার কাজে হাত দিচ্ছেন। কিন্তু এ-শিক্ষার উদ্দেশ্য, সুতরাং উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ-মহলে অনেক ভুল ধারণা ও অপরিপক্ক মতের অভাব নেই। ভারতবর্ষ যখন পূর্ণবয়স্কমাত্রের ভোটাধিকারে আধুনিক ডেমক্রেসি হ'তে চলেছে, বয়স্কশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া—এ মত বেশ চলতি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ হিসাবে না দেখে ভোটার হিসাবে দেখতে হবে। এই পুঁথিতে গ্রন্থকার বিদ্যায় অশিক্ষিত নাগরিকের পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে অবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাপক জোডের যে কথাগুলি তুলে আলোচনা করেছেন পলিটিশ্যানদের তা বিবেচনা করার সময় হয়েছে। বয়স্কশিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা মতে অনেকে বিশ্বাসী, যাদের কথা গ্রন্থকার বলেছেন: "কেহ কেহ বলেন যে বয়স্কেরা সকলেই সাংসারিক লোক,—সুতরাং তাহাদিগকে এমন কিছু শেখান উচিত যাহাতে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন হইতে পারে। অর্থাৎ কৃষককে কৃষিবিদ্যা, ধীবরকে মৎস্যবিদ্যা ও তন্তুবায়কে বয়নবিদ্যা শিখানই উচিত।" এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন,—"কৃষিবিদ্যা, মৎস্যবিদ্যা, বয়নবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারিগরি বিদ্যার অনুশীলন যে অনাবশ্যক, তাহা কেহই বলিবে না। কিন্তু জনশিক্ষা বা পরবর্তী শিক্ষার কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন না করিলেও ক্ষতি নাই—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় ডেনমার্কের পিপল্‌স্ হাই স্কুলগুলির প্রোগ্রামে।"

ডেনমার্কের এই জনশিক্ষার একটু বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, সেই বিবরণে অত্যুৎসাহী প্র্যাকটিকাল লোকদের বোজা চোখ কিছু খুলতেও পারে।

আমাদের দেশের নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষার কথা যাঁরা ভাবেন এই পুঁথি পড়ে তাঁরা উপকৃত হবেন। আশা করি, বয়স্কশিক্ষায় গ্রন্থকারের উৎসাহ বহাল থাকবে এবং তাঁর চিন্তা ও কাজ সে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টাকে সাহায্য করবে। নিরক্ষর জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মহাঋণ। সে ঋণ শোধ না করলে দেশের কোনও মঙ্গল নাই।

আষাঢ়, ১৩৫৬
১২৫, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৪৮ সনে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গভর্ণমেণ্ট যে প্রাদেশিক বয়স্কশিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করেন, সেই কমিটির সভ্য হিসাবে বৎসরাধিককাল বয়স্কশিক্ষাব সমস্যা বিষয়ে নানারূপ চিন্তা ও আলাপ-আলোচনা কবিবার প্রভূত স্নযোগ আমাদেব হইয়াছিল। পবে আবার গভর্ণমেণ্ট যখন বয়স্কশিক্ষা-পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখনও অতি প্রত্যক্ষভাবে তৎসংক্রান্ত প্রত্যেকটি কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবাব স্নযোগ পাইয়াছিলাম।

বাংলা ভাষায় বয়স্কশিক্ষা বা জনশিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তক বিশেষ কিছু নাই বলিলেও চলে। ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা-আন্দোলন প্রবর্তিত করিতে গিয়া প্রথমে যে অস্নবিধাব সম্মুখীন হইতে হয, তাহা হইতেছে এই বিষয়ে পুস্তকেব একান্ত অভাব। বয়স্কশিক্ষা-কেন্দ্রেব কর্মী বা শিক্ষক কি প্রণালীতে বয়স্কদিগকে শিক্ষা দিবেন, সে সম্বন্ধে তাহাকে কোন নির্দেশ বা ট্রেনিং না দিলে তাঁহাব পক্ষে কাজটি যে কতদূব জটিল ও সমস্যামূলক হইয়া দাঁড়াইবে, সেকথা সহজেই অনুমেয়। প্রথম বয়স্ক-শিক্ষণকেন্দ্রে ৬০০ ছয় শত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ট্রেনিং দিতে গিয়া গোড়াতেই এইরূপ একখানা পুস্তকের অভাব তীব্রভাবে অনুভব কবি। 'জনশিক্ষাব কথা' সেই অভাব-পূবণেবই প্রচেষ্টা।

এই পুস্তকেব প্রবন্ধগুলিকে সাধাবণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ, কয়েকটি প্রবন্ধে জনশিক্ষাব প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্যেব কথা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কযেকটি প্রবন্ধে জনশিক্ষা-আন্দোলনের পরিচালনা ও জনশিক্ষা-কেন্দ্রের সংগঠন বিষযে কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, গ্রন্থেব পবিশিষ্টে নিরক্ষব বা অশিক্ষিত বয়স্কদিগের পাঠ্যবিষয় ও পাঠদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি নির্দেশ দেওযা হইয়াছে।

বয়স্কশিক্ষাব পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে কয়েকটি কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে কবি। অক্ষর-জ্ঞান করাইবার জন্য তিন-চার মাস-সময় যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যায় এবং তাহার পব সংস্কৃতি-বিষয়ক (মৌখিক) পাঠ্যেব জন্য আরও আট-নয় মাস সময় ধরা হইয়াছে। যে-ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যে, এই সময়ে-সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ্য ভাল করিয়া শেষ করা যায় না, সে-ক্ষেত্রে

আবশ্যক-মত তিনি পাঠ্যের রদবদল করিয়া লইবেন এবং যে যে বিষয় বয়স্ক ছাত্রেরা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া বোধ হইবে সেই সেই বিষয়গুলি বাদ দিতে পারেন। তবে স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার-লাভ হইবে। সুতরাং তাহাদের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ না হইয়া যতখানি সম্ভব ব্যাপক হয় সে দিকে শিক্ষাব্রতীদিগের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বয়স্কশিক্ষা কমিটির সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

জনশিক্ষা-আন্দোলনের পরিচালক ও কর্মিবৃন্দের হাতে এই বইখানি তুলিয়া দিলাম। যদি ইহা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব-পালনে কিছু সহায়তা লাভ করেন তবেই এই শ্রম সার্থক এবং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'জনশিক্ষার কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গত চারি বৎসর ধরিয়া সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশে জনশিক্ষা-আন্দোলন অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু দেশের অশিক্ষা-বিমোচন এখনও সুদূরপরাহত। জনশিক্ষা আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশিক্ষা-আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং আজ ধীরে ধীরে হইলেও, সর্বত্রই শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা-বোধ লক্ষ্য করা যাইতেছে।

'জনশিক্ষার কথা' যে কিয়ৎপরিমাণে হইলেও, জনশিক্ষা-কর্মীর কাজে লাগিয়াছে, ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াই তাহার প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "শিক্ষা ও সাক্ষরতা" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল।

১৪শে জুলাই, ১৯৫৬ গ্রন্থকার

কলিকাতা।

আবশ্যক-মত তিনি পাঠ্যের রদবদল করিয়া লইবেন এবং যে যে বিষয় বয়স্ক ছাত্রেরা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া বোধ হইবে সেই সেই বিষয়গুলি বাদ দিতে পারেন। তবে স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার-লাভ হইবে। সুতরাং তাহাদের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ না হইয়া যতখানি সম্ভব ব্যাপক হয় সে দিকে শিক্ষাব্রতীদিগের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বয়স্কশিক্ষা কমিটির সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

জনশিক্ষা-আন্দোলনের পরিচালক ও কর্মিবৃন্দের হাতে এই বইখানি তুলিয়া দিলাম। যদি ইহা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব-পালনে কিছু সহায়তা লাভ করেন তবেই এই শ্রম সার্থক এবং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'জনশিক্ষার কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গত চারি বৎসর ধরিয়া সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশে জনশিক্ষা-আন্দোলন অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু দেশের অশিক্ষা-বিমোচন এখনও সুদূরপরাহত। জনশিক্ষা আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশিক্ষা-আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং আজ ধীরে ধীরে হইলেও, সর্বত্রই শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা-বোধ লক্ষ্য করা যাইতেছে।

'জনশিক্ষার কথা' যে কিয়ৎপরিমাণে হইলেও, জনশিক্ষা-কর্মীর কাজে লাগিয়াছে, ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াই তাহার প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 'শিক্ষা ও সাক্ষরতা' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল।

২৪শে জুলাই, ১৯৫৬

গ্রন্থকার

কলিকাতা।

জনশিক্ষার কথা

জনশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

গণতন্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝি ? গণতন্ত্রের যে সহজ ও মৌলিক সংজ্ঞা সচরাচর জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা হইতেছে এই,—জনসাধারণের যে রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহাই গণরাষ্ট্র বা গণতন্ত্র অথবা ডিমোক্র্যাসি। এব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায়—"Government of the people, for the people, by the people." কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ডিমোক্র্যাসির সংজ্ঞা ও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—এই দুইয়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। 'বৃটিশজাতি পাঁচবৎসর অন্তর মাত্র একবার স্বাধীনতা লাভ করে'—এই বহুল প্রচলিত ব্যঙ্গোক্তিটির মধ্যে একটি খাঁটি সত্য নিহিত আছে। ফ্যাসিপন্থী রাষ্ট্রগুলির কথা বাদই দিলাম, তথাকথিত ডিমোক্র্যাসি বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভারও কার্যতঃ মুষ্টিমেয় দলীয় মুরুব্বির (Party boses) হাতেই ন্যস্ত থাকে। ব্যাপক অর্থে আপামর জনসাধারণের সহিত রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার যেটুকু সংযোগ থাকে, তাহা নামমাত্র না হইলেও অতি ক্ষীণ ও অপ্রত্যক্ষ। ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে (city state) যে প্রকৃত ও নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্তমান যুগের দেশ-রাষ্ট্রের (country state) ক্ষেত্রে অচল বা অসম্ভব। কিন্তু গণদেবতার সক্রিয় সহানুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাবে গণতন্ত্র হয় স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর মাত্র। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা গণমনের অকুণ্ঠ সদিচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

কি উপায়ে জনগণের মন রাষ্ট্রের প্রকৃত অনুরাগী হয়—ইহাই জনশিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ। ঠিকপথে চালিত না হইলে বহুল প্রসারিত জনশিক্ষাও যে বিকৃতরূপে জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া অকল্যাণের পথে লইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রাক্‌যুদ্ধ কালের নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিস্ট ইটালি ও জাপান প্রভৃতি সুসভ্য ও উন্নত দেশে। এই সব রাষ্ট্রে একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের পরিপোষক ভ্রান্ত ও বিকৃত শিক্ষা-নীতি ও ব্যবস্থার সহায়তায় সমগ্র জাতিকেই বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন করিয়া তোলা হইয়াছিল। সর্বশক্তিমান নেতা ও দলের উপর শুভাশুভ-বিচারেব ভার দিয়া সমস্ত জাতি যেন বিমূঢ়ের মত তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে পারিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। সমসাময়িক ইতিহাস ইহার শোচনীয় পরিণামের সাক্ষ্য দিতেছে। শিক্ষাকে কি উপায়ে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া সহজ ও শুভপথে চালিত করা যায়, জনশিক্ষা-আন্দোলনের ইহাও একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোনের (Sir Richard Livingstone) কথায়—

"What is most important is to get the people mentally aud emotionally roused. They must learn to hear, to see, to think and to use their own powers". মনের দিক দিয়া জনসাধারণকে জাগাইয়া তোলাই বড় কথা। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নিজশক্তির সদ্ব্যবহারে সক্ষমতা—ইহাই এই আন্দোলনের মূলকথা।

ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-স্থাপনই ভারতীয় গণপরিষদের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত ভারতের ছত্রিশ কোটিরও অধিক নরনারীর প্রায় পঁচিশ কোটিই সম্পূর্ণ নিরক্ষর; অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৭ জনকে সাক্ষর বা literate বলা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পথে এই অজ্ঞতার অচলায়তন এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করিতেছে। এই বিশাল জনসমষ্টিকে 'যে তিমিরে সে তিমিরে' নিমজ্জিত রাখিয়া ভারতে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এক প্রহসন মাত্র। তাই আজ গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার অঙ্গরূপে জনশিক্ষা-প্রচারের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাষ্ট্রনায়কগণ ও জনসাধারণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিরক্ষরতা-দূরীকরণ ও অজ্ঞতা-নিরাকরণ-সম্বন্ধীয় নানারূপ প্ল্যান ও পরিকল্পনা রচিত ও আলোচিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জনশিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে,—জনগণের মনে নাগরিকত্বের অধিকার ও দায়িত্ব এবং জাতীয় ঐক্যবোধ জাগাইয়া তোলাই জনশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মুখ্যতঃ তিনটি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে ঃ

(ক) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে সাক্ষর করিয়া তোলা।

(খ) অক্ষর-জ্ঞান বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-দান ছাড়াও জনগণের অজ্ঞতা-দূরীকরণের ব্যবস্থা।

(গ) ব্যক্তিগতভাবে এবং দেশের ও দশের একজন হিসাবে প্রত্যেক নরনারীর মনে নাগরিকতার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা।

জনশিক্ষা বলিতে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের ন্যায় অনুন্নত দেশে, সাধারণ অর্থে নিরক্ষরতা-দূরীকরণই বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অজ্ঞতার বিরুদ্ধেই অভিযান।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্যের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে যে অর্থে জনশিক্ষা কথাটি ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষ তথা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে ঠিক সেই অর্থে উহার ব্যবহার হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে জনশিক্ষা বলিতে বিদ্যালয় হইতে লব্ধ শিক্ষার পরবর্তী অনুশীলন অথবা further education বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় জনশিক্ষা বলিতে প্রধানতঃ নিরক্ষরতা-

দূরীকরণই বুঝিতে হইবে। এই কথার কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আক্ষরিক জ্ঞানই অজ্ঞতা-দূরীকরণের প্রথম সোপান। অক্ষর-জ্ঞান লাভ না করিয়া যে-কোন সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার জ্ঞানের পরিধি এতটুকু বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য নহে। কাজেই জনশিক্ষা-অভিযানের প্রথম পর্যায় হইতেছে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

দ্বিতীয়তঃ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইলে প্রথমেই জনশিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। যদিও বাধ্যতামূলক অথবা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই নিরক্ষরতা-সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন কোটি কোটি অজ্ঞ ও নিরক্ষর পিতামাতা প্রত্যক্ষভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-প্রচলনের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। প্রথম এই কোটি কোটি নরনারীকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের তথা জাতির শিক্ষার পথও হইবে সহজ ও সুগম।

বয়স্কদের শিক্ষা কেবলমাত্র অক্ষর-জ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যাহাতে তাহারা শিক্ষার প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অন্ততঃ এতটুকু শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র অক্ষর-জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, অজ্ঞতায় ও অন্ধসংস্কারে অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন ও নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। এমনও দেখা যায় যে, অক্ষর-জ্ঞানহীন হইয়াও মানুষ সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাবে বর্তমানের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে সক্ষম। আবার ইহাও দেখা যায় যে, সামান্য অক্ষর-জ্ঞান লাভ করিলেও মানুষের অজ্ঞতার পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। বরঞ্চ চল্‌তি কথায় **'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'** হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষা যে কেবল মানুষকে সমাজে তাহার বিশিষ্ট স্থানটি লাভ করিতেই সাহায্য করে তাহা নহে, শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ তাহার

সাংসারিক ও আর্থিক উন্নতিসাধন করিতেও সমর্থ হয়। শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে পারিলেই নিরক্ষর নরনারী শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা দিবে এবং সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-ব্যবস্থায় আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। পুঁথিগত ও কারিগরী—উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থাই বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য করিতে হইবে। দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার সহিত এই শিক্ষার থাকিবে অতি নিকট সম্বন্ধ। কোন বাঁধা-ধরা সিলেবাসের মধ্যে বয়স্ক-শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হইবে না। অবস্থাবিশেষে সিলেবাসের নানারূপ পরিবর্তন ও তারতম্য হইবে অপরিহার্য।

অক্ষর-জ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যে যেটুকু আনুষ্ঠানিক পাঠ-দান অবশ্যম্ভাবী, সেটুকু দিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। অক্ষর-জ্ঞান যাহাতে স্থায়ী ও কার্যকর হইতে পারে, তাহার জন্য পরবর্তী শিক্ষা বা continuation of educaiion-এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। পরবর্তী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপকরণের, যথা—সহজবোধ্য নানাবিষয়ক পুস্তিকা, সংবাদপত্র, ছবি ও চার্ট, বক্তৃতা, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি-প্রদর্শন, বেতারবার্তা, যাত্রা, কথকতা, মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

সরকারী পরিকল্পনায় বয়স্ক-শিক্ষা

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Board of Education) কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি বয়স্ক-শিক্ষার যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :

বয়স্ক-শিক্ষার নামে এপর্যন্ত যত-কিছু উদ্যম ও প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ নিরক্ষরতা-দূরীকরণেরই নামান্তর। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে নিত্যপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার

পরিপ্রেক্ষিতেই জনশিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞেরা লেখা ও পড়ার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, কেননা, আক্ষরিক বিদ্যাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সোপান। কিন্তু কেবলমাত্র সাক্ষরতা দ্বারাই বিরাট জনশিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিয়া তাহাকে সুখী, স্বাস্থ্যবান ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকে পরিণত করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞেরা সুপারিশ করিয়াছেন যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সমবেত চেষ্টায় দেশের সমগ্র জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা পঁচিশ জনকে সাক্ষর কবিয়া তুলিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সাধারণ জ্ঞান-প্রসারের যাবতীয় ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। ১২ হইতে ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকে তাঁহারা বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী বয়স বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মূল সুপারিশগুলিকে মোটামুটি এগারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) নিবক্ষর বয়স্ক নরনারীকে সাক্ষর করিয়া তোলা, অর্থাৎ মাতৃভাষায় সাধারণভাবে লিখিতে ও পড়িতে শেখান।

(২) নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা এবং দেশ ও সমাজ-সেবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মান।

(৩) গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার কথা বুঝাইয়া দেওয়া।

(৪) ভারত ও জগতের প্রধান প্রধান সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা ও অনুধাবন।

(৫) দেশের ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্বারা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমতা ও গৌরববোধ জাগ্রত করা।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া।

(৭) সমাজ-জীবনে সমবায়ের উপকারিতা।

(৮) আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশেষ কোন একটি শিল্পের (craft) চর্চা।

(৯) লোকনৃত্য, গান-বাজনা ও অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আনন্দ ও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা।

(১০) আলাপ-আলোচনার মারফত সাধারণ নীতিজ্ঞান ও সৌজন্যবোধ জাগ্রত করা।

(১১) 'পরবর্তী শিক্ষার' আয়োজনকল্পে বিশেষভাবে সম্পাদিত সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা-প্রচার ও পাঠাগার-স্থাপন।

পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৮ সনের ৩১শে মে তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রোগ্রাম বা কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার জন্য কতকগুলি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন ঃ

(১) প্রত্যেক গ্রাম্য বিদ্যালয়কে গ্রামবাসীর শিক্ষা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক সম্মেলনের কেন্দ্ররূপে কাজে লাগান।

(২) বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও প্রয়োজনবোধে ভিন্ন প্রকারের কার্যসূচী-রচনা।

(৩) সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

(৪) পালাক্রমে গ্রাম্য কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের জন্য ফিল্ম-প্রোজেক্টার ও লাউড স্পীকার (loud speaker)-সংবলিত মোটর ভ্যান ইত্যাদিব ব্যবস্থা। প্রত্যেক কেন্দ্রে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার চিত্রাদি প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) প্রতি কেন্দ্রে একটি করিয়া বেতারযন্ত্র বা Radio রাখা এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও (All India Radio) মারফত প্রাপ্ত-বয়স্কদের উপযোগী বিশেষ প্রোগ্রাম (broadcast) প্রচার।

(৬) প্রত্যেক কেন্দ্রে লোকনাট্যাভিনয়-অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(৭) জাতীয় ও দেশাত্মবোধ-মূলক সঙ্গীত।

(৮) স্থানীয় শিল্পের (local craft) অনুশীলন।

(৯) জনস্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্প ও শ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞগণের লোকশিক্ষা-বিষয়ক বক্তৃতা।

(১০) বিশিষ্ট বক্তা, নেতা, সংবাদপত্রসেবী, সাহিত্যিক, কবি ও সমাজ-সংস্কারকগণকে আমন্ত্রণ করিয়া গ্রামে আনয়ন ও তাঁহাদের সহিত গ্রামবাসীর পরিচয় ও সংযোগ-সাধন।

(১১) নির্দোষ ক্রীড়াকৌতুক ও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আয়োজন।

(১২) পল্লীতে পল্লীতে মেলা বা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান।

শিক্ষা ও শিষ্টাচার

শিক্ষা মানে কি? কেবল কি নিরক্ষরতা দূর করাই শিক্ষা? না, কতকগুলি বড় বড় বুলি শেখা ও কতকগুলি জিনিসের সহিত সামান্য পরিচয় হওয়াই শিক্ষা? আসল শিক্ষা আমাদের সংস্কার বা অভ্যস্ত জীবনের ধারায় পরিবর্তন আনিয়া দেয়। সংস্কার-পরিবর্তনে বা মানুষের কু-অভ্যাসের স্থলে সু-অভ্যাসের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। কেননা, অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হইতে বিলম্ব হয় না এবং কথায় বলে 'ইল্লত যায় ধুলে, কিন্তু স্বভাব যায় না মলে'। স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য পুনঃ পুনঃ নির্দেশের প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর কাজ হইল শিক্ষার্থীর কু-অভ্যাসগুলির সংস্কারসাধন করা।

আমাদের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একটা বিশৃঙ্খলা সকলের চোখে পড়ে। ট্রেনের টিকিট কিনিতে হইবে, সকলেই আগে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে ভাল করিয়া বসিতে চান; ফলে টিকিট-ঘরের ছোট জানালাটির অপরিসর ফাঁকটুকুর মধ্যে এক সঙ্গে দশখানা হাত-প্রবেশের একটা অস্বাভাবিক তাড়া ও সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, গালাগালি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারামারি

পর্যন্ত সুরু হয়। অথচ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একে একে টিকিট লইলে, সকলেই সময়মত টিকিট পান, তিক্ততা জন্মিবার সুযোগ ঘটে না এবং পকেটমারেরা নিরীহ যাত্রীর পকেট মারিবার সুযোগও পায় না। এই-সব কু-অভ্যাস দূর করিবার দায়িত্ব জন-শিক্ষকেরই লওয়া উচিত।

যে সাধনাই করিতে যাই না কেন, প্রথমেই প্রয়োজন আসনসিদ্ধি। এমন ভাবে বসিতে হইবে যে, নিজের বসিতে কষ্ট হইবে না বা অপরের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবে না। কথায় বলে **'বসতে জানলে উঠতে হয় না'**। আপনাদের প্রত্যেককে হয়তো পনর-বিশজনকে একত্র লইযা পড়াইতে হইবে। এমনভাবে বসাইবেন, যেন কাহারও উঠিয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে অন্যেব ব্যাঘাত না ঘটাইয়াও তিনি নিজে উঠিয়া যাইতে পারেন। এক স্থানে দুই-একঘণ্টা বসিয়া কিছু শিখিতে হইলে এমনভাবে বসাইবেন, যাহাতে তাহার অনেকক্ষণ বসিতে অস্বস্তিবোধ না হয়। ক্লাসে নিম্নলিখিত ভাবে বসিবার অভ্যাস করান প্রয়োজন :

শিক্ষক

১ ২ ৩ ৪ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
৫ ৬ ৭ ১৬ ১৭ ১৮
৮ ৯ ১০ ১১ ১৯ ২০ ২১ ২২

গ্রামে যে স্থানেই বহুলোকের সমাগম হয়, সেই স্থানেই এই অভ্যাস-অনুসারে সাধাবণ লোকে পড়ুয়াদিগকে বসিতে দেখিয়া বসিতে শিখিবে। এইরূপে প্রতি ক্ষেত্রেই একটা শৃঙ্খলা-বোধ আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিবে।

শিক্ষকের কাজ হইবে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলি লইয়া বিচার করা এবং অভ্যাসগুলির সংস্কারসাধন করা, মুখে বলিয়া নয়, কাজে দেখাইয়া দিয়া, তবেই শিক্ষার্থীর মনে ছাপ পড়িবে। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখা অভ্যাস করা যেমন দরকার, তেমনি

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অভ্যাসগুলি সুসংস্কৃত হওয়া উচিত। শিক্ষক দেখিলেন যে, কোন পড়ুয়ার নখ-কাটা হয় নাই ; বড় বড় নখ ময়লায় ভরা, তখনি নখের ময়লার অপকারিতা এবং কি কি রোগ কিভাবে ঐ সুযোগে দেহে আশ্রয় লইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং সম্ভব হইলে নখগুলি কাটাইয়া দেওয়া শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার অঙ্গ। শিক্ষক যদি সেবাব্রতী হন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে সম্ভব। পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়ান হইয়া গেল, অথচ পড়ুয়াদিগকে শুষ্ক বইয়ের বোঝা বহিতে হইল না। সুযোগ উপস্থিত হইলেই শিক্ষক শিক্ষা দিবেন, এবং **'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'**—একথা তাঁহার ভুলিলে চলিবে না।

স্কুলগৃহেই ক্লাস করুন বা গাছতলাতেই ক্লাস করুন, সে স্থান পরিষ্কার রাখা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া ধরা হইবে। ঘর হইলে, ঝুল ঝাড়া ও ঘর ঝাঁট দেওয়া—এটাও কার্যসূচীর অন্তর্গত। তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে লাগিয়া এ কাজটি সমাধা করিবেন। ক্লাসের আশপাশের ঝোপ-ঝাড়, বনবাদাড় এইরূপে সমবেত চেষ্টায় পরিষ্কৃত হইয়া উঠিলে পড়ুয়াদিগের নোংরা পরিবেশে বাস করার অভ্যাস সুসংস্কৃত হইয়া জীবনযাত্রা খানিকটা আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

সমাজতন্ত্রবাদ শিখিতে হইলে বই-পড়া অপেক্ষা অধিক দরকার পরের প্রতি মমতাবোধ, কেননা, সমাজতন্ত্রবাদের মূলকথা মানুষের প্রতি দরদ। স্বার্থপর সমাজে দরদ মুখের কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু **'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না'**। আমাদের প্রাচীন সমাজে এত বড় বড় বুলি ছিল না বটে, তখনকার লোকে 'সমাজতন্ত্রবাদ' ইত্যাদির বড় বড় বাদানুবাদের কথা জানিত না বটে, তবে সমাজতন্ত্রবাদের মধুর আস্বাদটুকু দৈনন্দিন জীবনে লাভ করিত। সেইজন্য তাহাদের জীবন এখনকার মত এবন দুর্বহ হইয়া উঠে নাই, তখন মানুষে মানুষে এতখানি তফাৎ ছিল না।

প্রত্যেকের বাড়ীর সুখ-দুঃখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারে

একটু দরদ, একটু মমতার পরিচয় পাইলেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যেকার ব্যবধানটি ঘুচিয়া গিয়া আত্মীয়তাবোধ জাগিবে। শিক্ষিত যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে না দেন যে, তিনি বেশী জানেন। প্রকৃত বিদ্যার প্রধান লক্ষণ হইল বিনয়—বিদ্যায় যেন ঝাঁঝ না প্রকাশ পায়। এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলে নিরক্ষরকে আকর্ষণ করিতে পারা যাইবে না।

অশিক্ষিত ও অজ্ঞের প্রতি যেন কোনপ্রকার বিদ্রূপ বা অবহেলার ভাব না প্রকাশ পায়; ভাষায় যেন আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠে। আমাদের পল্লীগ্রামের চিরাচরিত প্রথানুসারে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে পাত্র বা পাত্রীর বয়স-অনুযায়ী মা, দিদি, মাসী, দাদা, ভাই, খুড়ো, মামা সম্বোধন করিতে যেন ভুল না হয়।

জননীর নিকট পুত্রের প্রশংসা এবং স্ত্রীর নিকট স্বামীর গুণপনা ব্যক্ত করা দরকার। বোনের নিকট ভায়ের বা কন্যার নিকট পিতার প্রশংসা করিতে না পারিলেও যেন কদাচ নিন্দা না করা হয়। কোন কার্যের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইলে, অন্যের অসাক্ষাতে করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক্যের আত্মসম্মান-বোধ জাগাইয়া তোলাই হইতেছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য; সকলের সম্মুখে নিন্দা করিলে উহার আত্মসম্মানে আঘাত করা হইবে। ক্রমাগত আত্মসম্মানে সামান্য আঘাত করিলেও, আত্মসম্মান সঙ্কুচিত হয়। যে শিক্ষায় মানুষের আত্মসম্মান-বোধ সঙ্কুচিত হয় এবং প্রসারিত হইবার অবসর পায় না, তাহা কু-শিক্ষা। এইরূপ শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াই ভাল।

দেহের উন্নতি ও রক্ষার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মনের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বহুদিন আহার গ্রহণ না করিলে যেমন আহারে রুচি চলিয়া যায়, ঠিক তেমনি পুরুষানুক্রমে লেখাপড়া শিখিতে না পাইয়া আমাদের দেশের লোক শিক্ষার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছে। অরুচির মুখে খাদ্য রুচিকর করিবার জন্য স্নেহময়ী মাতার যে অক্লান্ত চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, সেবাব্রতী শিক্ষককে সেইরূপ অক্লান্ত চেষ্টা ও সজাগ দৃষ্টির সহিত এমনভাবে মনের খোরাক

পরিবেশন করিতে হইবে যে, লোকের মনে শিক্ষার প্রতি বিরূপতার স্থলে অনুরাগ দেখা দেয়।

প্রত্যেকের প্রতি আত্মীয়তাবোধ জাগানও একটা বড় শিক্ষা। প্রত্যেকের মনে অপরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ জাগিলে, সমাজ-জীবন সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

জনমত ও জনশিক্ষা

গত শতাব্দীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রকে Fourth Estate আখ্যা দেওয়া হইত। বর্তমান সময়ে Fourth Estate বলিতে কেবল প্রেসকেই বুঝাইবে না। দেশ ও জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে প্রেস বা সংবাদপত্রের প্রভাব বহুলাংশে বাড়িয়াছে এবং তাহার সঙ্গে এমন আরও কয়েকটি প্রচারপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলির সম্মিলিত প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অতি গভীরভাবে অনুভূত হয়। ইহাদের মধ্যে সিনেমা বা চলচ্চিত্র ও রেডিও বা বেতারের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সাহায্যেই আজকাল রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রচার-কার্য চালানো হয়। জনশিক্ষা-প্রচার ও জনমত-গঠনে ইহাদের প্রভাব অসামান্য।

জার্মানীতে নাৎসী-দলের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস হইতে একটি শিক্ষা লাভ করা যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্রের সাহায্যে বদ্ধপরিকর যে-কোন সংখ্যালঘুদল অন্যান্য দলের বিরোধিতা চূর্ণ করিয়া রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিহত ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারে। ক্ষমতা হস্তগত করিবার ব্যাপারটি (capture of power) সুষ্ঠু ও নিরঙ্কুশ করিবার জন্য ইহারা দৈহিক বলপ্রয়োগ (physical intimidatiton) এবং ধুম-প্রচার (ballyhoo) চালাইয়া যায়। প্রচার-কার্যের যাবতীয় অস্ত্রই ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলটি হস্তগত করিয়া লয় এবং সুকৌশলে দলীয় মতকেই সমস্ত জাতির মত বলিয়া

চালাইয়া দেয়। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র, সিনেমা ও রেডিও, এমনকি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও দলীয় নীতির অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় এই যে, দলীয় ফতোয়াই জনমতে রূপান্তরিত হয়,—স্বাধীন চিন্তা ও দলনিরপেক্ষ মতামতের কণ্ঠ জোর করিয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আধুনিক যান্ত্রিক প্রচারের ফলে মানুষের মানসিক স্বাধীনতা যতটা খর্ব হইয়াছে, ইতিপূর্বে এমনটি আর কিছুতেই হয় নাই। চলচ্চিত্র চোখ ও কান দুইটিকেই যুগপৎ মুগ্ধ করিয়া অতি সুকৌশলে এবং দর্শকের অজ্ঞাতসারে তাহার চিন্তা ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রাযন্ত্রের ক্ষমতাও অসীম,—পুনরাবৃত্তির দ্বারা অসত্য বা অর্ধসত্যের মর্যাদা দেওয়া সংবাদপত্রের একটা বড় কাজ। আর বেতারের মারফত নিভৃততম পল্লীর দীনতম কুটীরবাসীও স্বকর্ণে প্রচারকের কথা শুনিতে পায়।

সুতরাং এতগুলি শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী জনশিক্ষার প্রচার ও জনমত নিয়ন্ত্রণ করা অতি সহজ।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারের আবশ্যকতাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। জনশিক্ষা-প্রসারের ফলে গভর্নমেণ্ট বা গভর্নমেণ্ট-বিরোধী দলগুলিকে সর্বদাই নিজেদের দলীয় নীতি (policy) এবং কার্যসূচীর (programme) সপক্ষে প্রচার চালাইয়া জনমতের আনুকূল্য ও সমর্থন লাভ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। রাষ্ট্রশাসন-যন্ত্র ও ব্যবস্থা আজকাল এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে ইহার বহুবিধ সমস্যা ও পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞাপিত না করিলে গভর্নমেণ্টের কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন। জীবন-সংগ্রামের উত্তরোত্তর তীব্রতা-বৃদ্ধি এবং অবসরের অত্যল্পতাও আধুনিক যুগের মানুষকে যান্ত্রিক প্রচারের মারফত অবসর-বিনোদনের সুযোগ খুঁজিতে বাধ্য করিতেছে। কর্মব্যস্ত মানুষের সময় কম, তাহার পক্ষে পাঁচ-ছয় ঘণ্টাব্যাপী থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় দেখা অপেক্ষা অল্প খরচে দুই

ঘণ্টার জন্য সিনেমায় যাওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক। মোটকথা, কি রাষ্ট্রব্যবস্থায়, কি সামাজিক মেলামেশায়, কি পারিবারিক আমোদ-প্রমোদে আধুনিক প্রচার-যন্ত্রগুলির ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা জনশিক্ষা-প্রসারের অজুহাতে অপপ্রচারের দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। তাহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাৎসী জার্মানীতে। জনতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া *Mein Kampf* গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং হিট্‌লার বলিয়াছেন ঃ

"The masses of the people feel very little shame at being terrorized intellectually and they are scarcely conscious of the fact that their freedom as human beings is being impudently abused."

গণ-মনস্তত্ত্বের এই দুর্বলতা অত্যন্ত মারাত্মক। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই জনশিক্ষা-আন্দোলন একটা নিম্নস্তরের রাজনৈতিক অপপ্রচারে পর্যবসিত হইতে পারে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে জনশিক্ষা-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জনশিক্ষা-আন্দোলনকে প্রকৃতই জাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় পরিণত করিতে হইলে ইহার সহিত জনগণের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। রাশিয়া, চীন ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশে জনশিক্ষা-আন্দোলনের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল জনসাধারণের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা। জনশিক্ষা-আন্দোলনকে প্রকৃতই গণ-আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে। প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার এবং শিক্ষা—এই উভয়ের মধ্যে একটা সংশ্লেষণ (synthesis) স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ, শিক্ষা ও প্রচার উভয়ই হইবে দলনিরপেক্ষ এবং জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী। স্বাধীন চিন্তা ও মতামত-প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা চলিবে না। প্রচার-কার্যের দায়িত্বভার রাজনীতিক, সংবাদ-ব্যবসায়ী বা বেতনভোগী রাজ-কর্মচারীর হাতে না রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও চিকিৎসক প্রভৃতির

হাতে অর্পণ করা যাইতে পারে। জনশিক্ষার প্রকৃত উদ্দীপনা আসিবে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতেই। এই আন্দোলনকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত করিতে হইলে ইহার কার্যক্রমকে জনসাধারণের ঐহিহ্য, আচার-ব্যবহার ও অভিরুচির পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। প্রতি গ্রাম বা জনপদে প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটির হাতে আন্দোলন-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। রাশিয়ায় জনশিক্ষা-আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে গ্রামের Cottage Reading Room (পাঠাগার), People's House (মিলনকেন্দ্র) বা Red cornerকে (চৌরাস্তা) কেন্দ্র করিয়া। চীনদেশেও কর্মিগণ গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরকেই তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র করিয়াছেন। আধুনিক সৈন্যদলের মধ্যেও জনশিক্ষার প্রসার চলে ছোট ছোট দল বা গ্রুপের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাবের মারফত। আমাদের দেশের জনশিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকেও সরকারী ফরমায়েসী প্রচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়া জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে না পারিলে জনশিক্ষা-আন্দোলন সফল করিয়া তোলা যাইবে না। এইজন্য প্রতি গ্রামের মধ্যস্থলে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থানীয় স্কুল, পাঠাগার, কাহারো বৈঠকখানা বা চণ্ডীমণ্ডপে কেন্দ্রটি স্থাপন করিতে হইবে। স্কুলগৃহ থাকিলেই সর্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ স্কুলগৃহ কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, উহাতে দশজনের সমান অধিকার,—বিনা সঙ্কোচে সকলেই সেখানে মিলিত হইবার সুযোগ পাইবে। উপরন্তু স্কুলগৃহের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণগুলিও ব্যবহার করা যাইবে। বিকাল বা সন্ধ্যাবেলাই জনশিক্ষা--কেন্দ্রের কাজের পক্ষে প্রশস্ত সময়। দিনান্তে চাষী-মজুর প্রভৃতিরা অন্ততঃ অবসর-বিনোদনের জন্যেও যদি কেন্দ্রে সমবেত হয়, তাহা হইলেই জনশিক্ষা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ সার্থক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কেন্দ্রগৃহটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইলে সেখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা রাখা দরকার। প্রয়োজনবোধে বয়স্ক ব্যক্তিগণের ধূমপানের আয়োজনও রাখিতে

হইবে। কারণ, চাষী, মজুর প্রভৃতি দৈহিক শ্রমজীবীদের পক্ষে ধূমপান ক্লান্তি-অপনোদনের প্রধান উপায়। কেন্দ্রগৃহটি নানারূপ ছবি, চার্ট ও প্রাচীর-পত্রিকায় সুসজ্জিত করিতে হইবে। সংবাদপত্র-পাঠের ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয় এবং একটি ছোটখাট লাইব্রেরি রাখা দরকার। কেন্দ্রের সংগঠন ও কর্মসূচীর ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি বয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে এমন একটি ধারণা জন্মাইতে হইবে যে, কেন্দ্রটি তাহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও সানন্দ সহযোগিতা চাই। তাহা হইলেই কেন্দ্রট হইবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং জনশিক্ষা-আন্দোলন হইবে দেশ ও জাতির পক্ষে সত্যসত্যই কল্যাণকর।

দশে মিলে করি কাজ

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, আমাদের বহুত্রুটিপূর্ণ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সংস্কার-সাধন করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষালাভের একটি উপায় মাত্র, আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষাব চরম পরিণতি নহে। আমাদের জীবনযাত্রাব পক্ষে ক্ষতিকব অভ্যাসগুলি লক্ষ্য করা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। যে অভ্যাসগুলি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কি প্রাণহানিকর, সেগুলি আমাদের অভ্যাসের দোষে ক্ষতিকর বলিয়াই মনে হয় না।

ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে ধরা পড়িবে যে, ইহাদের অধিকাংশই দাস-মনোভাব-জাত—আর এই দাস-মনোভাব বিদেশী শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যতদিন বিদেশীর শাসনব্যবস্থা অটুট ছিল, ততদিন সাধারণ লোকের চোখে রোগের মূলকারণটি ধরাই পড়িত না। এখন বিদেশী শাসন দূরীভূত হইয়াছে, একটু চেষ্টা করিলেই ইহা চোখে পড়িবে।

জনশিক্ষার কাজে যিনি ব্রতী হইবেন, দেশের লোকের প্রতি তাঁহার অসীম মমতাবোধ চাই। বর্তমান সমাজের নানাবিধ গলদের জন্য লোক কতখানি দায়ী, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দুষ্ট ব্যাধির স্রোত মাথা হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আজ সারা অঙ্গে সংক্রামিত হইয়াছে। এই ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে সারা সমাজ-দেহের চিকিৎসা করিতে হইবে।

দাস-মনোভাবের দুই-একটা অভিব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিব। বাড়ীর চাকরদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, নিজেদের খাওয়া-পরা ও ঠিক মাস-মাহিনা পাইলেই হইল; প্রভুর কাজের বেলায় যদি প্রভুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ পড়িয়া থাকিবে। বিলাতী প্রভুরা চাকর সাজিয়া আসিয়া প্রভুর সুখ-সুবিধা আদায় করিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের দরকার ছিল লম্বা ছুটি ও মোটা মাহিনার। প্রভুর কার্যে নিজেদের কার্য-বোধের অভাবই এই ব্যাধির মূল। এই ব্যাধি শীর্ষস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এখন সমাজের সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের জনমজুর, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অফিসের কেরানি হইতে বড়বাবু, যে স্থানেই চাকুরির সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই স্থানেই অধিকাংশ চাকুরিয়ার আপ্রাণ চেষ্টা হয় কত কম খাটিয়া কত অধিক অর্থ পাওয়া যায়। কর্মকর্তা, কর্ম ও কর্মচারী এক সূত্রে বাঁধা; কর্মকে বাঁচাইয়া না রাখিলে কর্মচারী বাঁচিবে না, এ বোধ দাসমনোভাবে জাগে না। যিনি আজ পরের কর্মে কর্মচারী মাত্র, তিনিই নিজের কাজ করিবার সময় কি অক্লান্ত চেষ্টাই না করেন! এস্থানে কর্ম, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে এক মমত্ব-বোধের অভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই কর্মের নিষ্ফলতা আজ আমাদের চোখে পড়িতেছে। এই মমত্ব-বোধ জাগিলে কর্ম হয় জীবন্ত, ইহার অভাবে কর্ম হয় প্রাণহীন বা মৃত। জীবন্ত আধারই ফল প্রসব করিতে পারে; মুমূর্ষু বা মৃত আধার ফল দান করিয়াছে, এ কথা কে কবে কোথায় শুনিয়াছে?

মমতা-বোধ অর্থের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রীতির

উপর। যিনি যে কাজ ভালবাসেন তাঁহাকে সেই কাজের ভার দেওয়া উচিত্ বা তাঁহার সেই কাজ বাছিয়া লওয়া উচিত।

কর্মীর ব্যক্তিত্ব এমন হওয়া উচিত যে, তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিবে। শিক্ষক পড়াইতেছেন plain living and high thinking, অথচ তিনি নিজে যদি বিলাসী হন বা নিজের কোন উচ্চ আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে তিনি অন্যকে ঐ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন না। **নিজে রং না মাখিলে অন্যকে মাখাইতে পারা যায় না।** আজকাল নির্দিষ্ট ঘণ্টায় বাঁধা শ্রমজীবীদিগের মধ্যে 'go slow' ভাব এই মমতা-বোধেব অভাব সূচিত কবে। ফলে কর্ম যথাবিহিত ভাবেই হয়, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় না। মমতা-বোধ জাগিলে কর্মী একটা কাজের ফাঁকে অন্য কাজ গুছাইয়া রাখে; কিন্তু মমতা-বোধের অভাবে কর্মী ফাঁক পাইলেই ফাঁকি দেয়। এই দুষ্ট মানসিক ব্যাধির জন্য কর্মকর্তা কম দায়ী নন। তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা কর্মীকে যতখানি সম্ভব বাদ দিয়া ফলের দিকে দৃষ্টি রাখায় আজ কর্মকর্তা, কর্মী ও কর্মের মধ্যে বন্ধন এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

কর্মীর দ্বিতীয় সূত্র হওয়া উচিত **একের বোঝা দশের লাঠি**। বঙ্কিম বাবু বলিতেন, বাঙ্গালী একা একশ' হইতে পারে, কিন্তু একশ' বাঙ্গালী এক হইতে পারে না। আমাদের নেতা ও জনসাধারণের ব্যবহার পর্যালোচনা করিলেই এই কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। আমাদের বহু দিনের মোহ এক দিনে ঘুচিবার নয়—এই কথাটি মনে রাখিয়া কাজে নামিতে হইবে। কর্মী যদি সকলের নিকট হইতে অকুণ্ঠ আজ্ঞানুবর্তিতা প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। সকলেই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন না। কর্মী যদি সমাজের কল্যাণ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথম হইতেই নির্বিঘ্নে পথ চলিতে হইবে। গোড়া হইতেই বাধা পাইতে আরম্ভ করিলে কাজ ত অগ্রসর হইবেই না, বরং কর্মীর মনে বিরক্তি-সঞ্চারে কর্মে একটা অবসাদ আসিবে। কর্মীকে সর্বাপেক্ষা নির্বিঘ্ন পথটি বাছিয়া লইতে হইবে। এই পথ কি?

আমাদের এখন যেরূপ মনের অবস্থা, আমরা সকলেই দশের মঙ্গলের জন্য গোড়া হইতেই ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত না-ও হইতে পারি। লোকেরা আপন আপন স্বার্থ বাঁচাইতে গিয়া দল পাকাইয়া কার্য পণ্ড করিবার চেষ্টা করিবে। সেই জন্য এমন পথে চলিতে হইবে, যে পথে বাধা কম, নানা স্বার্থের সংঘাতের সম্ভাবনা অল্প। প্রকৃতিতে দেখা যায়, প্রকৃতির ছোট-বড় কার্য অগ্রগতির সর্বাপেক্ষা নির্বিঘ্ন পথই অনুসরণ করে (Nature follows the path of least resistance)। নদী পাহাড় হইতে নামিয়া সাগরাভিমুখে যাইবার পথে উচ্চ ভূমি পাইলে পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া চলে। উচ্চভূমির সহিত প্রথমেই আপন বল পরীক্ষা করিতে লাগিয়া যায় না। তাহার লক্ষ্য সাগর, পথে অহেতুক দাপাদাপি করিলে দাপাদাপিই সার হইবে, সাগরে পৌঁছান যাইবে না। কর্মীর লক্ষ্য সমাজ-কল্যাণ; বিপরীত মতের লোকের সহিত বল পরীক্ষা করা নয়। লক্ষ্যকে ঠিক রাখিয়া নদীর মত পথের বাধাগুলির পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

কর্মীর প্রথম ও প্রধান বাধা সাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে এক করিয়া বড় কাজও করা যায়, কিন্তু মানুষের মন সহজে সবল সত্য বিশ্বাস করিতে চায় না। জোর করিলে অবিশ্বাস আরও প্রবল হইবে। অতএব লোকের যাহা নিষ্প্রয়োজন, যাহার অপচয় ঘটে, যাহা উদ্বৃত্ত বলিয়া লোকে ফেলিয়া দেয়, তাহাই সংগ্রহ করিয়া সমাজকল্যাণে নিযুক্ত করা উচিত। এখানেও প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ। প্রকৃতিতে দেখা যায়, একের যাহা আতিশয্য বা আবর্জনা, অন্যের তাহাই খাদ্য, প্রকৃতিতে কোথাও অপচয় নাই, প্রকৃতি 'waste not, want not'-সূত্র মানিয়া চলে। সেইজন্য তাহারই রাজ্য এমন সুন্দর শৃঙ্খলা।

সমাজের একজনের যাহা উদ্বৃত্ত অথবা নিষ্প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে আর একজনের প্রয়োজনে লাগিতে পারে। ধরুন, একজন শিক্ষিতের কিছু উদ্বৃত্ত সময় আছে, তাহা নিজের কাজে

লাগাইবার সুযোগ নাই বলিয়া অপচয় হয়, তবে এই সময়টুকু যদি নিরক্ষরকে অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন করাইবার কাজে নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের একজনের উদ্বৃত্ত সময় দিয়া সমাজের আর একজনের অভাব-মোচন হইতে পারে। কর্মীর লক্ষ্য এই দিকে থাকা উচিত।

সমাজের চিকিৎসক তাঁহার অবসরটুকু সমাজের সেবায় নিয়োজিত করুন, মা-ভগিনী দিন অবসরটুকু পথ্য প্রস্তুত ও রোগীর সেবায়, ঔষধ-ব্যবসায়ী নামমাত্র লাভে দিন ঔষধাদি, আর ধনী দিন তাঁর কিঞ্চিৎ ধন; দেখিতে দেখিতে গ্রামে ক্ষুদ্র একটি আরোগ্যশালা গড়িয়া উঠিবে। সমাজে যাহার রোগে সেবা করিবার লোক নাই, সে পাইবে এইস্থানে সেবা ও পথ্য; যাহার রোগে ঔষধ জুটে না, সে পাইবে ঔষধ; যাহার ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই, সে এখানে আসিলে পাইবে চিকিৎসার সুযোগ।

বিদ্যালয় গড়িতে হইবে? যাহার প্রচুর ভূমি আছে, তিনি বিদ্যালয়কে ব্যবহার করিতে দিন সামান্য একখণ্ড ভূমি; যাঁহাদের বাঁশঝাড়ে প্রচুর বাঁশ আছে, তাঁহারা দিন কিছু বাঁশ; যাঁহার খড়ের গাদায় প্রচুর খড় আছে তিনি দিন খড়, আর দীন শ্রমজীবীরা আর কিছু দিতে না পারে, দিক তাহারা তাহাদের শ্রমের কিছু ভাগ। ধনী তাঁহার উদ্বৃত্ত ধনের সামান্য ভাগ দিলেই গ্রামের পাঠশালার ঘর গড়িয়া উঠিবে। এইবারে যিনি শিক্ষিত, তিনি তাঁহার অবসরটুকু বিদ্যাদানে নিযুক্ত করুন, গ্রামে আর পাঠশালার অভাব থাকিবে না। গ্রামবাসীর এই উদ্যোগ দেখিলে সরকার বাহাদুর বসিয়া থাকিবেন না, সরকারী সাহায্য আসিতে তিলমাত্র বিলম্ব ঘটিবে না। কিন্তু সবটাই যদি সরকারকে করিতে হয়, তাহা হইলে কতদিনে এ কাজ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কারণ, একের পক্ষে যাহা বোঝা, তাহাই দশের হাতে হাতে লাঠি হইয়া দাঁড়ায়। যে-কোন সমাজ-কল্যাণকর কাজ এই পথে নির্বিঘ্নে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং গ্রাম্য দলাদলির আবর্তে পড়িয়া কর্মীকে হাবুডুবু খাইতে হইবে না।

সংগঠনের নীতি

বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার পূর্বে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু প্রচারকার্য চালান একান্ত প্রয়োজন। একথা সহজেই অনুমেয় যে, বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খোলামাত্রই তাহাতে যথেষ্টসংখ্যক নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে যোগদান না করাই সম্ভব, যদি না পূর্বাহ্ণেই তাহাদিগকে এইসব কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, জনশিক্ষা-আন্দোলনে প্রত্যেকেরই একটা গুরু কর্তব্য রহিয়াছে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে এবং যাহাতে যথেষ্টসংখ্যক নিরক্ষর নরনারী এইসব কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিতে আসে, তদ্বিষয়েও যত্নবান হইতে হইবে। কি উপায়ে এবং কাহাদের দ্বারা জনশিক্ষা-অভিযান পরিচালনা করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে সেই কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

কর্মী-নির্বাচন ঃ

এক-একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন উৎসাহী ও কর্মকুশল কর্মীর। কর্মী-নির্বাচন সুবিবেচনার সহিত না করিতে পারিলে আন্দোলনের ভিত্তিমূল শিথিল থাকিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ হইবে আশঙ্কাপূর্ণ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নির্বাচিত কর্মীকে গ্রামের দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও তাহাদের উপর নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে কেন্দ্রের কাজে ভিড়াইতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং জনপ্রিয় কর্মী ছাড়া অপর কেহ এই আন্দোলন-পরিচালনার ভার-বহনে অযোগ্য। প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয় এবং পাওয়া গেলেই তাহার পক্ষে অতি অল্প

অথবা বিনা পারিশ্রমিকে এইরূপ গুরুত্বদায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর কিনা, তাহাও বিবেচ্য। জনশিক্ষা-আন্দোলনের সহিত অন্যবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের যে একটা মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন-যোগ্য। অন্য সব আন্দোলনই (কমবেশী) নির্ধারিত মেয়াদী, অর্থাৎ কোন একটা আপাত উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই উহাব লক্ষ্য। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির মধ্যে জনশিক্ষা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। দেশে শতকরা নিরানব্বই জন নরনারীর অক্ষর-জ্ঞান জন্মিলেও জনশিক্ষা-আন্দোলনের কাজ শেষ হইবে না। ব্যাপক অর্থে অজ্ঞতা-নিরসনই হইতেছে এই আন্দোলনের প্রধান ও পরম লক্ষ্য, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ ইহার অব্যবহিত উদ্দেশ্যমাত্র। ইউরোপ ও আমেরিকাব প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহেও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমে জনশিক্ষার প্রচার ও প্রসার চলিতেছে। কাজেই জনশিক্ষা-আন্দোলনের কর্মীকে অনেকটা দেশ ও সমাজসেবাব্রত-রূপে এই কাজটি গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু অর্থের বিনিময়ে ও চাকুরি-হিসাবে এই কাজ গ্রহণ করা আত্মপ্রতারণামাত্র। অর্থের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবে না। অন্য দশজনের মত দেশকর্মীরও পেটের তাগাদা রহিয়াছে, সুতরাং সেদিক দিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবুও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ও অর্থ অপেক্ষাও অনেক বড় জিনিসের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেটি হইতেছে এই কাজটির প্রতি কর্মীর আন্তরিক অনুরাগ ও দরদ। যে-পরিমাণ পারিশ্রমিকই দেওয়া হউক না কেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ব্রতী কর্মিগণ যদি সত্যিকারের নিষ্ঠার সহিত এ কার্যে আত্মনিয়োগ না করেন, তবে এই আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সুদূরপরাহত।

কর্মী কে ?

গ্রামে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে ? কোন কোন স্থলে সুযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজব্রতীর অভাব হইবে না সত্য, কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় প্রায় ৩৬০০০টি গ্রাম আছে ; সুতরাং

সমস্যার গুরুত্বের তুলনায় যোগ্য কর্মীর সংখ্যা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই স্বেচ্ছাসেবী সমাজব্রতীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া অন্যত্রও কর্মীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রামের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই যে ব্যক্তিটির উপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তিনি হইতেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বহুধিকৃত ও বহুলবঞ্চিত এই গ্রাম্য গুরুলহাশয়েব শত অক্ষমতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও অনিবার্য কারণবশতঃ ইঁহাব উপরেই এই-জাতীয় আন্দোলন-পরিচালনার ভার ন্যস্ত কবিতে হইবে। এই স্বল্পে-সন্তুষ্ট পাঠশালার গুরুমহাশয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও নামমাত্র পাবিশ্রমিকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা সম্ভবপব হইবে বলিয়া আশা কবা যায় না। অগতির গতি পাঠশালার পণ্ডিতেব উপবেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের এবং তাহাদের পিতামাতার শিক্ষার ভাবও অর্পণ করিতে হইবে।

অবস্থা-বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষক দ্বারা জনশিক্ষার কাজ চালাইবার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে-সব আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা এই,—

(১) যে পদ্ধতিতে শিশুদের লেখাপড়া শেখান হয়, সে পদ্ধতি বয়স্কদের বেলায় অপ্রযোজ্য। শিশুদের শিক্ষাদান-কার্যে অভ্যস্ত এবং গুরুমহাশয়-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত মহাশয় বয়স্কদের শিক্ষাদানকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(২) দিনের খাটুনির পর আবার সন্ধ্যাবেলায় বড়দের শিক্ষা দেওয়া সেই একই প্রাথমিক পণ্ডিতের পক্ষে হইবে অত্যধিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ভারাক্রান্ত উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড, the last straw upon the camel's back। অর্থের তাগিদে কাজ হয়ত তিনি চালাইয়া যাইবেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাই হইবে বহুলাংশে নিষ্ফল।

(৩) যে প্রাথমিক শিক্ষক নিজের কাজেই যোগ্যতা দেখাইতে

পারেন না (দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা খুব বেশী নহে), তাঁহাকে আবার এই নূতন কাজের ভার দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্যাটি এতই ব্যাপক ও বিরাট্ এবং ইহার আশু সমাধান করিতে হইলে এত অধিকসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন এবং উপযুক্ত কর্মীর এতই অভাব যে, অনন্যোপায় হইয়াই প্রাথমিক শিক্ষক-সম্প্রদায়ের সাহায্য-গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই।

স্থানীয় উপদেষ্টা-সমিতি :

শিক্ষক বা কর্মী-নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থানীয় উপদেষ্টা-সমিতি-গঠনেরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া এই আন্দোলন সাফল্য অর্জন করিতেই পারে না। প্রত্যেক গ্রামে—যেখানেই শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে—সেইখানেই অল্পসংখ্যক (তিন হইতে পাঁচের অধিক নহে) উৎসাহী ও প্রভাবশীল ব্যক্তিসহ একটি করিয়া ছোট কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটির সভ্যগণ স্থানীয় জনসাধারণকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন, তাহাদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবেন এবং যাহাতে অজ্ঞ অশিক্ষিত নরনারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করে, তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। এক কথায় ইঁহারাই হইবেন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালক ও কর্ণধার। ইঁহাদের আন্তরিকতা ও সক্রিয় সহানুভূতির উপরই নির্ভর করিবে জনশিক্ষা-আন্দোলনের ক্রমপ্রসার ও সাফল্য।

গ্রামের উচ্চ বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ও গ্রামের পদস্থ ও মান্য ব্যক্তি কেহ কেহ এই কমিটির সভ্য হইলে ভাল হয়। এই কমিটির সদস্যগণের সহায়তায় জনশিক্ষা-আন্দোলনের প্রতিকূল সমস্ত রক্ষণশীল বিরুদ্ধাচরণ দূরীভূত করা সম্ভব। কোন কোন স্থলে এইরূপ আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে যে, সংরক্ষণশীল কায়েমীস্বার্থ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

বিশেষ করিয়া চা-বাগান ও মিল-ফ্যাক্টরির পুঁজিবাদী মালিকদের নিকট হইতে এই প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করা যায়। এই সব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আইন প্রবর্তন করাও আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষাও অধিক কার্যকর হইবে জনসাধারণের মনে এই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সহযোগিতা ও অনুকূল ভাব সৃষ্টি করা এবং নানাভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্যকলাপের দিকে আকৃষ্ট করা। জনসাধাবণের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তিরাই এই কাজের ভার-গ্রহণে সর্বাপেক্ষা যোগ্য।

প্রাথমিক ব্যবস্থা ঃ

কোন গ্রামে কেন্দ্র খোলাব পূর্বে খানিকটা প্রচারকার্য বা প্রোপাগাণ্ডা চালাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কি উপায়ে এবং কি কি উপকরণের সাহায্যে এই প্রচারকার্য চালাইতে হইবে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদত্ত হইল ঃ

(১) প্রত্যেক গ্রামেই নিরক্ষর বয়স্ক স্ত্রীপুরুষের যথার্থ সংখ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক নিরক্ষর বয়স্ক লোকের নাম বয়স ও বাড়ীর অবস্থান একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্যই ভিন্ন কেন্দ্রে অথবা একই কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে করিতে হইবে। অধিকন্তু বয়সের তারতম্য হিসাবে ১২ হইতে ১৮।১৯ বৎসর এবং ১৯।২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্যও ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা করা উচিত। এই জন্যই সর্বপ্রথমে গ্রামের তথ্যাদি সংগ্রহ বা সার্ভে (survey) করা আবশ্যক।

(২) গ্রামে গ্রামে সভা। উদ্যোক্তাগণ গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবেন। গ্রামের মধ্যে যে-সব স্থানে বহুলোক একত্র মিলিত হয়, সেই সব জায়গায় সভার আয়োজন করিয়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। এই সব সভায় রেডিও-সাহায্যে গান-বাজনা অথবা প্রোজেক্টারের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন

করিতে পারিলে জনসাধারণের মন সহজেই আকৃষ্ট করা যায়। কর্মিগণকে প্রতি গৃহে গিয়া গৃহস্থ ও তাহার পরিবারের স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলকেই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

(৩) প্রচারকার্যের আর একটি বিশিষ্ট উপায় হইতেছে প্রাচীর-পত্র (poster) ও পুস্তিকা-বিতরণ। তাৎপর্যপূর্ণ ছবি-সংবলিত ও বড় বড় হরপে ছাপা প্রাচীর-পত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বভাবতই মুখের কথা অপেক্ষা ছাপার কথার উপর সহজেই আমরা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি। পোস্টারের মারফৎ গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় অনেক সংবাদ অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে প্রচার করা সম্ভব। এই সব পোস্টারের সাহায্যে অতিসহজেই নিরক্ষর নরনারীর কৌতূহল উদ্রিক্ত করা যায়। গ্রামের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত, তাহাদের কর্তব্য হইবে অন্য দশজনের নিকট পোস্টারের ছবি ও কথাগুলি সরল সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করা ও তাহাদিগকে শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে উৎসাহিত করা। এই সব পোস্টারে শিক্ষা, কৃষি, বাজার-দর, স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন খবর প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত হইতে পারে।

শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার দুই-এক মাস পূর্ব হইতেই ক্ষেত্র-প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করা উচিত। স্কুল-কলেজের দীর্ঘ অবকাশে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে এই প্রচার-কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

জনশিক্ষা-প্রসারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য

"একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ী চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

"শহরবাসী একদল মানুষ শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হলো এনলাইটেন্‌ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।"—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিমবঙ্গে মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৬,০০০, জনসংখ্যা আনুমানিক ২,৬০,০০,০০০। কলিকাতা ও শহরতলীর কথা বাদ দিলে বাকী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জন লোকই গ্রামবাসী। এই লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী নরনারীর নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার কথা চিন্তা করিলেই কবিগুরুর উক্তিটি সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। দেশের সমগ্র লোক-সংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক ১২ হইতে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং এই বয়ঃক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রায় এককোটি নরনারী সম্পূর্ণ নিরক্ষর বলিয়া অনুমিত হয়। এই এককোটি বয়স্ক নরনারীকে আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া তোলা ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক শিক্ষাদান-ব্যবস্থা করাই আমাদের আশু সমস্যা।

উল্লিখিত সংখ্যাগুলির যথার্থতা বা নির্ভুলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহারা যে দেশের শিক্ষা-সমস্যার গুরুত্ব-জ্ঞাপক, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। এই বিরাট্ সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভবপর, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। দেশের ও জাতির অন্যান্য নানাবিধ সমস্যার মতোই নিরক্ষরতা-সমস্যাও তখনই মিটিতে পারে, যখন জাতির সম্মিলিত শক্তি ইহার সমাধানে নিয়োজিত হইবে।

চীন, রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে জন-শিক্ষা-প্রচেষ্টার যে-সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহাতে সরকারী উদ্যমের সহিত জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের নিরক্ষরতা-দূরীকরণ-আন্দোলনে শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই যে একটা নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে,—একথা বর্তমান রাজ-নৈতিক সচেতনতার (political consciousness) দিনে বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের

সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। গ্রামের সংখ্যা পূর্বেই বলিয়াছি কিঞ্চিদধিক ৩৬,০০০। কাজেই সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিটি গ্রাম্য বিদ্যালয়কে জনশিক্ষা-কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত করা হইলেও অর্ধেকেরও বেশী গ্রামে একটি করিয়া কেন্দ্র খোলা সম্ভব নহে। উপরন্তু ২৫,০০০ বিদ্যালয়ের অনেকগুলিই শহর-অঞ্চলে স্থাপিত। তাহা ছাড়া, সমগ্র দেশব্যাপী জনশিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে ও চালাইতে যে-পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকার সে-পরিমাণ ব্যয়ভার-বহনে আদৌ সক্ষম কিনা, সে কথাও বিবেচ্য। কাজেই সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীব সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই আন্দোলন কিছুতেই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। জনশিক্ষা-প্রচারের গুরুভার সম্পূর্ণ-ভাবে শিক্ষাজীবীর (Professional teachers) হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে, উচিতও নহে। প্রথম কথা, যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষকের অভাব। দ্বিতীয়তঃ, শিশুশিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষকের বয়স্ক-শিক্ষা-বিষয়ে আংশিক অক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, একই ব্যক্তি দ্বারা দিনে শিশুর ও সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে বয়স্কের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক ও বয়স্ক-শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতির কাবণ। দেখা গিয়াছে যে, পেশাদার শিক্ষক অপেক্ষা স্কুল-কলেজেব ছাত্রছাত্রী বয়স্কদের শিক্ষাদান-কার্যে অধিকতর পটু ও তৎপর। চীনদেশে জনশিক্ষা-প্রচারে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অবদান প্রশংসনীয়। চীন বা তুরস্কে যে আন্দোলন সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সুপরিচালিত হইলে এদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। এজন্য প্রথমেই চাই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্রসমাজের মনে একটা তীব্র দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলা। যে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী অশিক্ষা ও অজ্ঞতায় নিমগ্ন, সে দেশের মুক্তি বা অগ্রগতি যে সুদূর-পরাহত, মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান শিক্ষিত ব্যক্তির ইহা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অভুক্ত ও অনাদৃত রাখিয়া কেবল একটিমাত্র

অঙ্গের পরিচর্যা দ্বারা যেমন দেহযন্ত্র সুস্থ ও সচল রাখা যায় না, ঠিক তেমনি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিয়া মুষ্টিমেয় জনকয়েকের শিক্ষা-দীক্ষায় সমগ্র সমাজের উন্নতি-সাধন হয় না। আমি আর দশজনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ—এইকথা মনে করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি যেন আত্মশ্লাঘা অনুভব না করেন। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতিবেশীর অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, দুঃখ-দৈন্য—এ তাঁহাবই নিজস্ব দায়।

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

দেশের বা সমাজের বৃহদংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যদি সম্প্রদায়বিশেষ শিক্ষায়-দীক্ষায় অগ্রণী হইয়া যায় এবং তাহার ফলে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তাহারই বিষময় রাজনৈতিক পরিণাম বর্তমান ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা ও পাকিস্তানের উদ্ভব। জাতি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণসাধন করিতে হইলে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যবর্তী বেড়া বা ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইয়া এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে হইবে।

আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাত্রসমাজই এই কার্যের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য। প্রগতিমূলক যে-কোন আন্দোলনের পুরোভাগেই আমরা ছাত্রসমাজকে দেখিতে পাই। জনশিক্ষা-আন্দোলনের পতাকাও ছাত্রসমাজ বহন করিবে—ইহা কোন আশাতিরিক্ত কথা নহে। এই কাজে ছাত্র ও যুবসমাজের বিশেষ যোগ্যতার মূলকারণ হইতেছে তাহাদের উৎসাহের আতিশয্য। কোন-এক মনীষী বলিয়াছেন: "Every great and commanding movement in the annals of the world is the triumph of enthusiasm. Nothing great was ever achieved without it."

জনশিক্ষা-আন্দোলনের সাফল্যও নির্ভর করিবে কর্মিগণের উৎসাহের

উপর। পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন ২৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। ইহা হইতে নিতান্ত শিশুশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হিসাবে ১০।১২ লক্ষ বাদ দিয়া বাকী দশলক্ষ তরুণ কর্মীকেও যদি জনশিক্ষা-প্রসারে নিযুক্ত করা যায় এবং প্রত্যেক কর্মী যদি গড়ে এক বৎসরে অন্ততঃ একটি নিরক্ষর ব্যক্তিকেও সাক্ষর করিয়া তুলিবার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে, তাহা হইলেই নিরক্ষরতা-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

"সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষিত নরনারীই এই মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন শিক্ষিত বা literate বলিয়া অনুমান করা হয়। এই অনুমান নির্ভরযোগ্য হইলে—

প্রারম্ভিক বৎসরে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪০ জন। পরবর্তী বৎসরে শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন শিক্ষিত হইবে। অর্থাৎ আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই দেশের নিরক্ষরতা দূর হইয়া যাইবার কথা। উল্লিখিত হারে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে দশ বৎসরে মোট জনসংখ্যা শতকরা দশজন করিয়া বৃদ্ধি পাইলেও জনশিক্ষা-আন্দোজনের অগ্রগতি অটুট ও অব্যাহত থাকিবে। "Each one teaches one"-নীতির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার ব্যয়স্বল্পতা। এত কম খরচে এত বিরাট্ আন্দোলন পরিচালনা করিবার আর কোন পন্থাই দেখা যায় না।

কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজকে জনশিক্ষাব্রতে উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, চাই উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ। এমন কতকগুলি ও সহজ-পাঠ্য বই রচনা করা প্রয়োজন, যাহার সাহায্যে বয়স্ক নিরক্ষরকে অতি অল্পায়াসেই লেখাপড়া শিখান যায়। এই সকল বই বা সহজপাঠ

যথেষ্ট সংখ্যায় মুদ্রণ এবং বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থাও করা দরকার। এবিষয়ে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি-মনের নৈরাশ্য ও হীনতার ভাব দূর করিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য চাই একটা প্রীতিকর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সাহচর্য।

বাঁধা-ধরা রুটিন বা নিয়ম-নির্ঘণ্টের বেড়াজাল সৃষ্টি না করিয়া বয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ইতোপূর্বে বহুবার বলা হইয়া থাকিলেও, আবার ইহা বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষিত লোকমাত্রকেই বৎসরে অন্ততঃ একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। স্কুল-কলেজের দীর্ঘ অবসরগুলি ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে দেশের সর্বত্র জনশিক্ষার বাণী প্রচার করিবার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়টাতে যদি দেশের তরুণসম্প্রদায়কে জনশিক্ষার কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও নিরক্ষরতা-সমস্যার একটা দ্রুত ও ব্যাপক সমাধান সম্ভবপর হয়।

সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেবাব্রতী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষভাবে মিল-কারখানার মালিক, চা-বাগানের কর্তা, দেশের ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সর্বোপরি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-ছাত্র প্রভৃতি সকলকেই নিষ্ঠার সহিত এই মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কাহারও একক চেষ্টায় এত বড় একটা জাতীয় সমস্যার আংশিক সমাধানও হইতে পারে না। দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষিত নর-নারীকে শ্রদ্ধার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করিতে বলি:

"So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a taaitor, who having been educated at their cxpense pays not the least heed to them."

"নিত্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অনশনে ও অজ্ঞতায় দিন কাটায়, অথচ তাহাদেরই অনুগ্রহে যাহারা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজন মনে করে না—আমি সেই শ্রেণীর আত্মসর্বস্ব লোকদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করি।"

জনশিক্ষাকেন্দ্রে সান্ধ্য বৈঠক

পড়াইবার পূর্বে প্রথমেই দেখিতে হইবে, কাহাদিগকে পড়াইতে হইবে। যাহারা পড়িতে আসিবে, তাহাদিগকে মোটামুটি দুইটি দলে ফেলা চলে। প্রথমটি নাবালক-নাবালিকার দল, বয়স তাহাদের ১২ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত; দ্বিতীয়টি সাবালক-সাবালিকার দল, বয়স তাঁহাদের ১৯ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত। এই দল দুইটিতে নানা বয়সের লোক থাকায় সমস্যা দেখা দিবে নানা প্রকারের। সকলের মনের বিকাশ সমান নয়, অতএব রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গী এক হইতে পারে না।

সাধারণতঃ যাহারা পড়িতে আসিবে, তাহাদিগের জীবনে অবকাশ বড়ই কম। এই কম অবকাশটুকুর খানিকটার মধ্যে তাহাদিগের মনের খোরাক যোগাইয়া দিতে হইবে। পড়াশোনাটা যেন গুরুভার কর্তব্যে পরিণত না হইয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এমন ভাবে গুরু বিষয়বস্তু পরিবেশন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা লঘুচিত্তে খেলার ছলে উহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায়।

নানা রুচির লোক নানা জিনিস ভালবাসে। অবসর-বিনোদনের উপায়স্বরূপ সেইগুলিকে ব্যবহার করিলে লোকেরা আপনি আসিবে, প্রত্যহ ডাকিয়া আনিতে হইবে না। কেহ কেহ দেশের খবর শুনিতে ভালবাসে; তাহাদিগকে মোটামুটি দৈনিক সংবাদ ১০ মিনিট শুনাইলে মন্দ হয় না। দেশ-বিদেশের সংবাদ শুনাইবার সময় দেশ-বিদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের সহিত একটু পরিচয় ঘটিবে। নিত্য

শুনিতে শুনিতে দেশবিদেশের মোটামুটি পরিচয় মুখস্থ হইয়া যাইবে। ভূগোলের শুষ্ক নামগুলি কষ্ট করিয়া মনে রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। নিজেদের ইতিহাস ও পরের দেশের ইতিহাস কিছুটা প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে আর নূতন করিয়া বই পড়িয়া শিখিতে হইবে না। প্রত্যহ খবর শুনাইবার সময় গ্লোব ও বিষয়-সম্পর্কীয় মানচিত্র খুলিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানটি কোথায়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। নিত্য দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর রূপের একটা ধারণা হইতে থাকিবে।

কেহ কেহ পুরাণকথা শুনিতে ভালবাসেন। তাঁহাদিগকে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন পুরাণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া গল্পকথা পড়িয়া শুনাইলে ভালই হইবে। কথক-ঠাকুরদের মত মনোরম করিয়া রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের কথা গল্পচ্ছলে বলিতে পারিলে পড়ুয়ার অভাব হইবে না বরং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শিক্ষক মহাশয়ের কিছু ভেট-লাভ হইবে। কেহ কেহ কীর্তন ভালবাসেন; মাঝে মাঝে কীর্তনের ব্যবস্থা করিলে ভালই হইবে। ক্রমশঃ পড়ুয়াদিগের মধ্য হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বাছিয়া কীর্তনীয়ার দল,—শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় অনুসারে গড়িয়া তুলিতে পারিলে এবং মাঝে মাঝে উষাকালে গ্রাম-সংকীর্তন বাহির করিলে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে একটা অপূর্ব সাড়া জাগিবে।

ছায়াচিত্র দেখাইয়া শিক্ষা ও আনন্দের ব্যবস্থা হইতে পারে। সম্ভবপর স্থানে রেডিও ও কলের গানের ব্যবস্থা করিলে গ্রামবাসীদিগের একঘেয়ে জীবনে আনন্দের বান ডাকিবে।

মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে ছেলে ও বুড়ার দল বাছিয়া লইয়া কোন নাটক অভিনয় করাইতে পারিলে বা গ্রাম্য সভা ডাকিয়া গান ও আবৃত্তির একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলে পড়াশুনায় উৎসাহ বাড়িবে। এইরূপে মাঝে মাঝে দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার বা নানা গ্রাম্য খেলাধূলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গ্রামবাসীদের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় একটা নূতনত্বের আস্বাদ মিলিবে।

সপ্তাহে একটা দিন অন্ততঃ গ্রামের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগ শুনিয়া আলোচনা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা চিন্তা করিবার জন্য রাখা উচিত। ইহাতে গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখা দিবে এবং গ্রামবাসীরা স্বাবলম্বী হইবার প্রেরণা লাভ করিবে। এই আসরে এইরূপ সমস্যার অন্য দেশে কিরূপ সমাধান সম্ভব হইয়াছে, তাহার গল্প করিয়া ও ছবি দেখাইয়া বুঝাইলে গ্রামবাসীরাও ঐ পথে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে।

মাঝে মাঝে পড়াশুনায় উৎসাহিত করিবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পড়ুয়াদিগকে গ্রাম্য সভা ডাকিয়া নিজ গ্রামের বা নিকটস্থ জনপদের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির সভাপতিত্বে মানপত্র দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

কাহারও দূর দেশের আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া দিয়া পত্রশেষে পড়ুয়াকে নাম সহি করিতে দিলে সে পড়াশুনায় উৎসাহ পাইবে। শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত যাহাতে শীঘ্রই পড়ুয়া নিজের বা বাপ-পিতামহের নাম লিখিতে ও পড়িতে পারে। ইহাতে পড়াশুনায় উৎসাহ বাড়িবে।

চাঁদা করিরা কিছু তামাকের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর তামাক শ্রান্তি ঘুচায়। তামাকের লোভে অনেকে এই পড়াশুনার বৈঠকে যোগ দিতে আসিয়া কিছু শিখিয়া যাইবে।

মেয়েদের বেলায় এই সব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ দেশের সংবাদ শোনান ভাল; ইহাতে জ্ঞান বাড়িবে, দেশ ও বিদেশ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইবে এবং কূপ-মণ্ডূকতা ঘুচিবে। পুরাণাদি-পাঠের ব্যবস্থা নিত্য করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে লোকে শিক্ষয়িত্রীর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষয়িত্রী পড়ুয়াদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলে ক্লাসের কাজ নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইবে। কীর্তন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মেয়েদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

মেয়েদের মধ্যে যাহাদের গলার স্বর মিষ্ট, তাহাদিগকে লইয়া একটা কীর্তনীয়ার দল করিতে পারিলে মন্দ হয় না। ইষ্ট দেবদেবীর স্তবগুলি মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলে মেয়ে-পড়ুয়ার দল আকর্ষণ করা সহজ হইবে। পূজাব্রতাদি সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা হওয়া দরকার। ছায়াচিত্রাদি-বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মেয়েদের বেলাতেও খাটিবে।

পুরুষদিগের ক্লাস ঋতু অনুসারে গাছতলায়, মাঠে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহে বা কোন লোকের চণ্ডীমণ্ডপে হওয়া সম্ভব। কিন্তু মেয়েদের বেলায় এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। পালা করিয়া নানা পড়ুয়ার বাড়ীতেই সমবেত হইয়া মেয়েদের ক্লাস করা দরকার। সেই গৃহস্থকে সেদিন একটু পান-দোক্তার বন্দোবস্ত করিতে হইবে মাত্র। এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদিগের মধ্যে হৃদ্যতা বাড়িবে এবং মেলামেশার ফলে দশজনে মিলিয়া কাজ করিবার শক্তি লাভ করিবে।

নানা সামাজিক বিষয়ে যোগাযোগ-ক্ষেত্ররূপে এই মেয়েদের আসরটিকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভাল হয়। সামান্য সামান্য অসুখে, ছেলেপিলেদের বা মেয়েদের ঔষধ, পথ্য বা অন্যান্য করণীয় সম্পর্কে ইঙ্গিত বা ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য যেন শিক্ষয়িত্রীর থাকে। মেয়েদের মধ্যে প্রাচীনারা এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

গান, আবৃত্তি, স্তবপাঠ, সূচীশিল্প বা কুটীরশিল্পে পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ মেয়েদের হাতে তৈরী জিনিসগুলির মাঝে মাঝে প্রদর্শনী করা ভাল। ইহাতে মেয়েদের ঐরূপ কাজে উৎসাহ বাড়িবে। মানপত্র দিবার ব্যবস্থা মেয়েদের বেলাতেও করিতে হইবে, তবে এক্ষেত্রে পুরুষ-সভাপতির পরিবর্তে কোন বিশিষ্ট মহিলাকে সভানেত্রী করা উচিত। হাতের কাজের জন্য পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

পড়ুয়াদিগের অভাব, অভিযোগ, দোষ, গুণ প্রভৃতির প্রতি মমতাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিলে পড়ুয়ার অভাব হইবে না। শিক্ষক বা

শিক্ষয়িত্রীর সম্পূর্ণ সেবার মনোভাব লইয়া এ কাজে নামা উচিত। মা যেমন নিজের সন্তানের হাত-পা-মুখ মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেন, প্রীতি ছাড়া কোন ঘৃণা বা অবহেলার ভাব তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠে না, ঠিক তেমনি ভাবে পড়ুয়াদিগের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এ কাজে নামিতে হইবে। দেনা-পাওনা লইয়া দর-কষাকষি করিলে সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইবে।

বয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ

পুত্রের বয়স ষোল বৎসর হইলেই তাহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিবে—ইহা প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই কথাটির মধ্যে যে সত্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক লোক-শিক্ষাব্রতীর সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই মনে একটা হীনতার ভাব (inferiority complex) আছে। তাহারা যে অজ্ঞ ও নিরক্ষর, এই কথাটা অহরহ তাহাদের মনে একটা ব্যথা দিতেছে। সুতরাং তাহাদের সহিত মেলামেশায় ও ব্যবহারে সর্বদাই একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ; মনে রাখিতে হইবে যে, বয়স্কেরা বড়, তাহারা শিশু নহে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে অবাঞ্ছিত হইলেও নিয়মশৃঙ্খলা-রক্ষা বা এমন কি পাঠে অমনোযোগ বা শৈথিল্য-নিবারণের অজুহাতে সময় সময় শিক্ষক মহাশয়কে নানাবিধ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণবয়স্ক ছাত্র শিক্ষকের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু বয়স্কদের বেলায় এই ব্যবস্থা একেবারেই অচল। আনন্দময় ও আত্মসম্মানজনক পরিবেশের সৃষ্টি না করিতে পারিলে কিছুতেই বয়স্ক ব্যক্তিকে লেখাপড়ার কাজে আকৃষ্ট করা যাইবে না।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক. সি. লাওব্যাক তাঁহার বহুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায়

বয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যে-কয়টি নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কর্মীর মনে রাখা উচিত। অবশ্য, ডাঃ লাওব্যাক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শেষ কথা নহে। অবস্থার তারতম্যে এইসব নীতিরও পরিবর্তন হইতে পারে। প্রত্যেক কর্মী ও শিক্ষাব্রতীর বয়স্ক-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার।

বয়স্কদের শিখিবার ক্ষমতা শিশু বা বালকের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক কম, অনেকেরই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায়। 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' —শাস্ত্রীয় বাক্য ; সুতরাং ইহা যে অকাট্য, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। বরঞ্চ 'Life is a continuous process of learning'.— এই কথাটির সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া জনশিক্ষার কাজে অগ্রসর হইলে সুফল আশা করা যাইতে পারে। বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পর বিখ্যাত শিক্ষা-শাস্ত্রবিদ্ প্রোফেসর ই. এল. থর্নডাইক (E. L. Thorndike) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি দশ বৎসরের বালক অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি ও ভালভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে। বালকের স্মৃতিশক্তি বয়স্কের অপেক্ষা সতেজ ও প্রখর হইলেও বয়স্কের ধারণাশক্তি ও বুঝিবার ক্ষমতা বালক অপেক্ষা অনেক গুণে বেশী। তদুপরি বয়স্কের পক্ষে আর একটা সুবিধার কথা হইতেছে এই যে, বালক অপেক্ষা তাহার জ্ঞাত শব্দের সমষ্টি (vocabulary) অনেক অধিক। অধিকসংখ্যক জানা শব্দের সাহায্যে বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই বহু জিনিস বুঝিতে পারে। আবার লিখিবার বেলাতেও বয়স্ক ব্যক্তি অল্প চেষ্টাতেই লেখার কৌশল ও ভঙ্গী আয়ত্ত করিতে পারে। কারণ, বয়স্কের হাত ও আঙ্গুলের পেশীসমূহ অপেক্ষাকৃত সবল ও সংযত। কাজেই বয়স্কের লেখাপড়া শিখাইবার কাজে অহেতুক নৈরাশ্যবাদীর স্থান নাই। বাস্তবক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, গড়ে তিন-চার মাস সময়ের মধ্যেই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তির অক্ষর-পরিচয় করান, এবং পঠন-লিখন

ও সামান্য পাটীগণিত শেখান সম্ভব। এইরূপে সাত ও নয় মাস-সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোর্স (course) বা পাঠ্যবিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে শেষ করিয়া দেওয়া যায়। অত্যাচার, অনিয়ম, অল্পাহার ও দারিদ্র্যহেতু দেহযন্ত্র বিকল না হইয়া গেলে চল্লিশ বৎসর বয়সের পরেও যৌবনের শক্তি ও ক্ষমতা বেশ কিছুকাল, কোন কোন ক্ষেত্রে ষাট-সত্তর বৎসর পর্যন্ত, অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মানুষের নূতন করিয়া লেখাপড়া শিখিবার ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় না।

মনস্তত্ত্ববিদ্ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Frued) মতে প্রীতিকর অনুষঙ্গই (pleasant associations) আমরা মনে রাখি আর যাহা অপ্রীতিকর তাহা আমাদের স্মৃতিপট হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায়। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের শিক্ষাতেই একটি প্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কারণ, শিশুর ন্যায় বয়স্কদের উপর কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আরোপ করা চলে না।

শিশু অথবা বালক-বালিকাদের শ্রেণীতে একত্র ৩৬। ৪০ জনকে শিক্ষা দেওয়াই রীতি। অবশ্য, সংখ্যা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু বয়স্কদের বেলায় এত বেশী শিক্ষার্থীকে একত্রে না লওয়াই উচিত। ডাঃ লাওব্যাক বলেন যে, একসঙ্গে পাঁচজনের বেশী বয়স্ক শিক্ষার্থীর ভার লওয়া উচিত নহে, দুই বা তিনজন হইলেই ভাল। তাঁহার মতে একজন আর একজনকে শিখাইবে এবং দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে এবং তৃতীয় চতুর্থকে এইভাবে 'Each one teaches one'—মূলমন্ত্রটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। আদর্শের দিক দিয়া এই অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী লইয়া কাজ আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয় হইলেও সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিচার করিলে একসঙ্গে ২৫। ৩০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে লইয়া লেখাপড়ার কাজ সুরু করা যাইতে পারে।

প্রথমেই বয়স্ক-শিক্ষাব্রতীর (Teacher of adults) মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুদের শিক্ষায় সাধারণতঃ যেসব পদ্ধতি অবলম্বিত হয়,

তাহা এক্ষেত্রে একেবারেই অকেজো। শিক্ষক-শিক্ষণের স্কুল-কলেজের (Training School & College) শিক্ষাপদ্ধতির কোন প্রয়োগই চলিবে না। একটা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই কাজে নামিতে হইবে ঃ

(ক) বয়স্ক শিক্ষার্থীকে কোনমতেই বুঝিতে দেওয়া হইবে না যে, সে তাহার শিক্ষক বা অন্য যে-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা হীন। সুযোগের অভাবে তাহার অক্ষর-পরিচয় বা শিক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলেই সে অন্য দশজনের সমকক্ষ হইতে পারে এবং তাহার ভিতরে লেখাপড়া শিখিবার সমস্ত ক্ষমতাই বিগুমান।

(খ) বয়স্ক ব্যক্তির সহিত প্রথম হইতেই বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, নতুবা অতি তুচ্ছ কারণেও বয়স্ক শিক্ষাথীর মনে শিক্ষক ও শিক্ষার প্রতি বিরূপতার ভাব জন্মিতে পারে।

(গ) বিদ্যালয়ের শ্রেণীর ন্যায় বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র ও শিক্ষকের জন্য বৈষম্যমূলক বসিবার আসন, যথা—বেঞ্চ ও চেয়ার—না রাখাই উচিত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ কোন বিভেদ বা দূরত্ব না রাখিয়া সমান আসনেই বসিবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সহিত আলাপ-আলোচনার সময় প্রভুত্বব্যঞ্জক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা চলিবে না। সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যালাপ শিক্ষাথীর মনে বিশ্বাস জন্মাইবার একমাত্র উপায়।

(ঙ) বয়স্ক শিক্ষাথীর সহিত সম্মানজনক ব্যবহার না করিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। বয়স্কেরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর (sensitive)। কোন বিষয় বুঝিতে বিলম্ব করিলে, অথবা কোন কথার ভুল উত্তর দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ভুলটি দেখাইয়া সংশোধনের চেষ্টা বৃথা। ভুলের জন্য তাহাকে বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ না করিয়া শুদ্ধ কথাটির পুনরুক্তি করিতে হইবে। দুইবারের বেশী 'না' শব্দটি ব্যবহার করা মারাত্মক। হয়ত তৃতীয়বারে শিক্ষাথী আদৌ কথাই বলিবে না।

(চ) শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে কোন কথার পুনরাবৃত্তি না করাই উচিত। ইহাতে অনেকটা মুরুব্বিয়ানার ভাব প্রকাশ পায় এবং তাহা বয়স্কদের পক্ষে বিরক্তিজনক।

(ছ) প্রতি পদেই উৎসাহবর্ধক কথায় শিক্ষাথীর মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। প্রত্যেক সাক্ষর ব্যক্তিকে তাহার নিরক্ষর প্রতিবেশী বা বন্ধুর লেখাপড়া শিখাইবার কাজে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে প্রত্যেকের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মিবে।

(জ) একটানা অনেকক্ষণ একই বিষয়ের আলোচনা বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। কাজেই একনাগাড়ে ২০।২৫ কি ৩০ মিনিটের বেশী একই বিষয় লইয়া আলোচনা চালান উচিত নহে।

(ঝ) সর্বোপরি বয়স্কদের শিক্ষার যে কথাটা সর্বাপেক্ষা বেশী মনে রাখা প্রয়োজন, তাহা এই যে, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি উভয়কেই করিতে হইবে সহজ ও প্রীতিকর। বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রটিকে সাধারণ স্কুল-কলেজের শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলিলে ভুল করা হইবে। নানাবিধ কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর ভিতর দিয়া শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দের ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সরলভাবে গল্প বলার প্রণালীতে বয়স্কদের শিক্ষা দিবার রীতিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ। বয়স্ক-শিক্ষার সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যবহার ও কর্মকুশলতার উপর।

আমাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা

শিক্ষক বা কর্মীর পথ হওয়া উচিত যতটা সম্ভব নির্বিঘ্ন। দেশের আচার-ব্যবহারকে প্রথম হইতেই যদি কুসংস্কার বলিয়া অবহেলা বা বিদ্রূপ করা হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ প্রাচীনপন্থী লোকই কর্মীর পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। দেহের ঘা খোঁচা দিয়া আরাম করা যায় না, একথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের অধিকাংশ সদাচার, কালের ইঙ্গিত না মানায়, আজ কুসংস্কারে দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিতের দৃষ্টিতে যে আচারগুলি দেশকালের প্রভাবে আজ কু-অভ্যাস বা কদাচার বলিয়া ঠেকিতেছে, ঐগুলি একদিন সদাচার বলিয়া গণ্য হইত। একটি সামান্য উদাহরণ লইয়া বিচার করিলে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

গোবর-লেপার প্রথাটি ধরা যাক। প্রাচীনকালে, অধিকাংশ লোকের বাড়ী ছিল মাটির প্রস্তুত। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু টাটকা গোবর দিয়া লেপিয়া লওয়া হইত। সেকালে টাটকা গোবরের অভাব ছিল না, প্রত্যেকের বাড়ীতেই দুধের জন্য গরু থাকিত। বহুদিন ধরিয়া এই সদাচার আচরিত হইবার ফলে লোকদের এই আচার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গেল।

তাহার পর যখন যুগের পরিবর্তন ঘটিল, কাঁচা মেঝের স্থলে পাকা সিমেণ্টের বা চুন-সুরকির মেঝে প্রচলিত হইল, তখনও কিন্তু লোকে গোবরের অভ্যাস ভুলিতে পারিল না। মাটির বাড়ীতে যাহা ছিল সদাচার, তাহাকে পাছে লোকে আলস্যে বা অন্য কোন কারণে পালন না করে, সেইজন্য গোবরের সহিত শুচিতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মনে বদ্ধমূল করাইয়া দেওয়া হইল। কাঁচা মাটির বাড়ীতে গোবর দিয়া লেপনের বিশেষ প্রয়োজন সেকালেও ছিল, আজিও আছে; কিন্তু পাকা বাড়ীতে, স্থান ও কালের পরিবর্তনে, ঐ প্রথা শুচিতার পরিবর্তে অশুচিতার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও দেবমন্দিরে শ্বেত পাথরের মেঝে প্রচুর জলে ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়, কই গোবর, দিয়া লেপিয়া ত মন্দিরের শুচিতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয় না! প্রয়োজনবশে স্থান-কাল-পাত্রের অনুরোধে, যে আচার একদিন সদাচার বলিয়া গণ্য হইত, বহুদিনের সংস্কারবশে সেই আচরণ অধিকাংশ মানুষ আজও পালন করিয়া চলিয়াছে; স্থান, কাল ও পাত্রের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই। প্রয়োজনবশে যে আচার

সদাচার বলিয়া অবশ্য-পালনীয়, প্রয়োজন ফুরাইলেই সেই আচরণ কদাচারে দাঁড়ায়—এই কথা কৌশলে শিখাইতে হইবে। সদাচারমাত্রই দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য। যে আচরণে দেহ অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে, অথবা মনে ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব জন্মায়, উহাকে পরিহার করিয়া চলাই উচিত।

সেকালে জীবনযাত্রায় যে সদাচারগুলি পালন করিয়া চলিতে হইত, সেগুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ কবা চলে। একটির মূলে স্বাস্থ্যোন্নতি, অন্যটির মূলে ছিল অর্থনৈতিক কারণ।

বৃহস্পতিবারের কতকগুলি বিধি-বিষেধের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যয়-সংক্ষেপ ও সঞ্চয়। রবিবার Bank বন্ধ দিলে ত দোষ হয় না। কারণ ত ঐ একই। যুগেব পরিবর্তনে বারেব পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাত্র। সপ্তাহে একদিন মা-লক্ষ্মীর নামে ব্যয় সংক্ষেপ ও সঞ্চয় করিলে মন্দ কি? ইহাকে কুসংস্কার না বলিয়া সদাচাব বলা উচিত। ঠিক এই কারণে বৃহস্পতিবারে ও রবিবাবে ধানের গোলা ছুঁইতে নাই। চাষীদের ধানের গোলাই একমাত্র ধনভাণ্ডার, সময় অসময়ে উহারা ধান বেচিয়া প্রয়োজনমত অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ কবে। সপ্তাহে দুইদিন ধানের গোলা ধর্মের নামে স্পর্শ করা বারণ করিয়া দিয়া ব্যয়-সংক্ষেপ ও সঞ্চয়ে অভ্যস্ত করান মন্দ কি?

এইরূপ স্থলে আচরণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেও ফল ভালই হয়। কিন্তু বহুস্থলে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাওয়ায় সদাচার কদাচারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ একটি উদাহরণ হইল আমাদের আঁতুড়ের ব্যবস্থা। যে সতর্ক গৃহব্যবস্থা আতুর প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানকে বাহিরের নানা সংক্রামক বীজাণু হইতে বাঁচাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল, উহাই প্রাণহানিকর হইয়া উঠিল। উদ্দেশ্য ছিল, যে কেহ যেন বাহির হইতে আসিয়া আঁতুড়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া সংক্রামক বীজাণু না ছড়ায়। লোকের এই আনাগোনা বন্ধ করিবার জন্য আঁতুরের কক্ষকে নোংরা আঁতুড়ে পরিণত করা হইল। আঁতুড়কে অশুচি করিয়া লোকের

আসা-যাওয়া বন্ধ করা হইল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল কি? ইহা আমাদের অজ্ঞানতারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিমাত্র।

লোকজনের আসা-যাওয়া বন্ধ না করিয়াও প্রকৃত উদ্দেশ্য যে বজায় রাখা চলে, তাহা বর্তমান কালের স্বাস্থ্যকর প্রসূতিভবনগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল সদ্যোজাত সন্তানকে ও প্রসূতিকে প্রাণ-হানিকর অদৃশ্য বীজাণুর আক্রমণ হইতে বাঁচান, উহার জন্য নানা ব্যবস্থার মধ্যে নানা লোকের অহেতুক যাতায়াত বন্ধ করা একটি ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া একটা উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় আতুর আঁতুড়ে পরিণত হইল। যে ক্ষেত্রে নিখুঁত শুচিতার প্রয়োজন ছিল, সে ক্ষেত্রে বীভৎস নোংরা ব্যবস্থা দেখা দিল; ফলে প্রসূতির নানা রোগে ভুগিয়া মরিবার সম্ভাবনা বাড়িল এবং সদ্যোজাত সন্তানের ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু সুলভ হইয়া উঠিল। প্রকৃত জ্ঞান-প্রচারে যে এই **'উল্টা বুঝলি রাম'**-গোছের ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যে স্থানে নূতন সৃষ্টি হয়, সে স্থানকে অশুচি রাখাই মহাপাপ এবং পাপের চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস; তাই আমাদের এই দুর্দশা।

আর একটি প্রকৃত সদাচারের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। আমাদের দেশে কোন গৃহে বসন্ত রোগ হইলে, বলা হয় 'মায়ের কৃপা' হইয়াছে। মায়ের কৃপাগ্রস্ত পাত্রকে স্পর্শ করা বারণ, যেহেতু 'মা'টি বড়ই কোপনস্বভাবা। এই সূত্রে বাড়ীর অন্যান্যের পক্ষে তিক্ত খাওয়ার ব্যবস্থা এবং মৎস্যাদি আমিষ খাওয়া বারণ হইয়া যায়। কোপনস্বভাবা মা বাড়ীতে আসায় তাঁহার অরুচিকর কাজ কাহাকেও করিতে নাই। কোন রোগ বাড়ীতে হইলে ভিক্ষুককে বলিতে শোনা যায়, 'বাছা, বাড়ীতে রোগ, ভিক্ষা দিতে নাই।' সামান্য অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য ছিল মায়ের ভয় দেখাইয়া রোগীকে বাঁচান এবং সংক্রামক ব্যাধি হইতে অন্যান্যকে রক্ষা করা।

মাছের বসন্ত রোগ হয়, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এইরূপ রোগাক্রান্ত মাছ খাইলে যে বসন্ত হইবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বসন্ত রোগের প্রকোপের সময় মানুষের যেমন বসন্ত রোগ হয়, সেইরূপ প্রকৃতিতে অন্যান্য জীবেরও এই রোগ হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্য এইরূপ বিধি-নিষেধ। মানুষ কিন্তু সহজে বিধি-নিষেধ মানিতে চায় না। সেইজন্য কোপনস্বভাবা মায়েব রোগের ভয় দেখাইয়া এই নিষেধ করা হইয়াছে। একটা স্বাস্থ্যকর সদাচার-পালনে বাধ্য করিবার রীতি অদ্ভুত হইতে পাবে, কিন্তু আচারাদি যে কুসংস্কার নয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোগের বাড়ীতে ভিক্ষা দিতে নাই; ইহাকে কি কুসংস্কার বলে? রোগীর গৃহের বীজাণুদুষ্ট চাউলাদি ভিখারী লইয়া গিয়া সমাজের সুস্থ অংশে রোগ ছড়াইতে পারে, সেইজন্য এইরূপ বারণ; ইহা একটি স্বাস্থ্যকর প্রথা। এই উদাহরণগুলি দিয়া আলোচনার উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন কোন প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, ঐরূপ প্রথা-প্রচলনের উদ্দেশ্য কি ছিল। উদ্দেশ্য বুঝিয়া উহার স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী সংস্কারসাধন করিয়া লওয়া যায় কিনা, তাহা দেখা দরকার। বিলাতী ভাবে ভাবাপন্ন শিক্ষিত-দিগের বিচারহীন সমালোচনায় দেশের বহু মঙ্গলকর প্রথার মূলে কুসংস্কার বলিয়া কুঠারঘাত করা হইয়াছে; ফলে আমরা বিদেশী সদাচারগুসি গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং দেশের সদাচার গুলিও নির্বিচারে ত্যাগ করিয়া সদাচারহীন হইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি।

গ্রামের বৈঠকে দেশাচারগুলির আলোচনা চলিতে পারে। আলোচনায় আচারগুলির উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া দেশ-কাল পাত্রোপযোগী সংস্কার কিরূপে সাধন করা যায়, তাহার বিচার হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে দেশের প্রকৃত কুসংস্কারগুলির ধীরে ধীরে সংস্কারসাধন হইবে এবং একটা তিক্ত গ্রাম্য দলাদলির সৃষ্টি হইবে না।

আচারে লক্ষ্মী ও বিচারে পণ্ডিত—এই মূল্যবান প্রবাদটি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের দারিদ্র্য ও ব্যাধি দূর করিয়া ঘরে ঘরে আবার মা-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সদাচার-পালনে পূর্বের ন্যায় নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। পুরাতন সদাচারগুলির মধ্যে যতগুলিকে দেশ-কালোপযোগী সংস্কারসাধন করিয়া লইতে পারা যায়, সেগুলিকে পরিহার করিবার কোন কারণ নাই এবং নূতন বৈজ্ঞানিক যুগে নূতন নূতন দেশ-কালোপযোগী সদাচারগুলি-পালনের দিকে শিক্ষক ও কর্মীর দৃষ্টি থাকা উচিত এবং বিদ্যাপীঠ বা গ্রামের সান্ধ্য বৈঠক এইগুলির আচরণ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত স্থান। কথায় বলে :

"যদি মানুষ করতে চাস্ পো।
তবে সভায় নিয়ে গিয়ে থো॥"

ডেনমার্কে জনশিক্ষা

যেসব প্রগতিশীল দেশে শিক্ষিতের হার খুব বেশী অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন কিংবা আরও বেশী শিক্ষিত বা সাক্ষর, সে-সকল দেশেও জনশিক্ষার সমস্যা বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সে সমস্যা ভারতের সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশেও জনশিক্ষা-প্রসারের সুনিশ্চিত ও পরিকল্পিত পন্থা অনুসৃত হয়। এইসব দেশে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু যে বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা হয়, তাহার পরবর্তী বয়সেও যাহাতে তাহারা লেখাপড়া-চর্চার সুযোগ পায়, তাহার জন্যই এইসব দেশে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে। চৌদ্দ, পোনর কি ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক পাঠ সমাপ্ত করিয়াই যে-সকল বালক-বালিকাকে জীবিকা-উপার্জনে বাহির

হইতে হয়, তাহাদের পরবর্ত্তী শিক্ষাকেই এইসব দেশে জনশিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জনশিক্ষা-আন্দোলনে অগ্রণী দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক আদর্শ-স্থানীয়। শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদের 'পরবর্ত্তী শিক্ষার' জন্য ওয়ার্কারস এডুকেশনাল এসোসিয়েশন (Workers' Educational Association), সংক্ষেপে W. E. A. নামক প্রতিষ্ঠান যে কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহাই আরও ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হইতে দেখি কৃষিপ্রধান ডেনমার্কের পিপ্‌লস্ হাই স্কুলস্ (Peoples High Schools) নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা। ইংলণ্ডের মোট সাড়ে চার কোটি জনসংখ্যার সত্তর হাজার নরনারী ওয়ার্কারস্ এডুকেশনাল এসোসিয়েসনে (W. E. A.) 'পরবর্ত্তী শিক্ষা' লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু ফুটবল এসোসিয়েশনের যে-কোন ফাইন্যাল খেলায় ইহাব প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক জনতার সমাবেশ হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জনপ্রিয়তার দিক দিয়া জনশিক্ষা আন্দোলন এখনও তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। W. E. A. ছাড়াও ইংলণ্ডে নয়টি আবাসিক জনশিক্ষা কলেজ আছে। কিন্তু W. E. A. আবাসিক প্রতিষ্ঠান নহে, ইহার সদস্যগণ সন্ধ্যা-বেলায় একত্র হইয়া পাঠাদি-অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকে। ডেনমার্কের জনসংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ অর্থাৎ ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার তের ভাগের একভাগমাত্র। কিন্তু পিপল্‌স্ হাই স্কুলের সংখ্যা ৫৭। এইগুলি সবই আবাসিক প্রতিষ্ঠান,—বৎসরে তিনমাস হইতে পাঁচমাস কালের মেয়াদে 'পরবর্ত্তী শিক্ষা-শিবির' খোলাই ইহাদের প্রধান কাজ। প্রতিবারে এইসব শিক্ষাশিবিরে প্রায় ছয়হাজার নরনারী যোগদান করিয়া থাকে। ডেনমার্কের ন্যায় সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশেও P. H. S.-আন্দোলন খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। সুইডেনে ৫৯টি, ফিনল্যাণ্ডে ৫৩টি এবং নরওয়েতে ৩২টি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। ইংলণ্ডের W. E. A. অপেক্ষা

ডেনমার্কের P. H. S. জনপ্রিয়তা ও কার্য্যকারিতার দিক দিয়া অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

ডেনমার্কে P. H. S.-আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত্র হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সহিত সংগ্রামে ডেনমার্কের পরাজয়ের পর হইতে। এই সংগ্রামের পরাজয়ের ফলে ডেনমার্কের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বগ্রাসী জার্মান সংস্কৃতির (German Kultur) প্লাবনে ডেনমার্কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জাতির এই সঙ্কটের দিনে যে-দুই ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া জাতিকে জার্মান-প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহাদের নাম—ম্যঁশিয়ে গ্রাণ্ডভিগ্ (Grundtvig), একজন ধর্মযাজক এবং ম্যঁশিয়ে কোল্ড (Kold), একজন মুচি। ইঁহাদের উদ্যোগেই প্রথম People's High School স্থাপিত হয় এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, ক্রমশঃ তাহারই আদর্শে সমগ্র জাতি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। ফলে প্রবল জার্মান-প্রভাব সত্ত্বেও ডেনমার্ক তাহার নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ডেনমার্কের ছেলেমেয়েরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্তির পর মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা পঁচিশজন মাত্র পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ পাইত। বাকী ৭৫ জনের ভাগ্যেই শিক্ষার আর কোন সুযোগ ঘটিত না। প্রথমে M. Kold ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক-বয়স্কাদের লইয়াই জনশিক্ষা-কেন্দ্রগুলি চালাইবার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু M. Grnndtvig ইহাতে অসম্মত হন। তাঁহার মতে প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কমবয়স্কদের জন্য 'পরবর্তী শিক্ষা'র ব্যবস্থা করা নিরর্থক। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখাইলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। Grundtvig-এর মতে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভিন্ন 'পরবর্তী শিক্ষা'র প্রকৃত বুনিয়াদ স্থাপিত হইতে পারে না। সেই জন্য পিপল্‌স্ হাই স্কুলে আঠার বৎসরের কম বয়স্কদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শিক্ষার নূতন ক্ষেত্রে ইঁহারা এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিলেন। প্রকৃত শিক্ষালাভের পক্ষে বাল্যকালই একমাত্র প্রকৃষ্ট সময়—ইহাই ছিল এতদিন পর্যন্ত সকলের বদ্ধমূল ধারণা। ইঁহারা প্রমাণ করিলেন যে, অনভিজ্ঞ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষে যে বিষয় পাঁচ বা ছয় বৎসরের কমে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, তাহাই প্রাপ্তবয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তিন হইতে পাঁচ মাসকালের মধ্যেই শিখিয়া ফেলিতে পারে। এই মতের সমর্থনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন (Sir Richard Livingstone) বলেন : "They bring something which no schoolboy can ever have—a fully growu intelligence, a sense of the value and meaning of education, and that practical experience of life without which history, literature and philosophy are lifeless phantoms."

পিপল্‌স্ হাই স্কুল সবই আবাসিক প্রতিষ্ঠান। গ্রীষ্মের সময় তিনমাস-কাল মেয়েদের জন্য এবং শীতকালে পাঁচমাস পুরুষদের জন্য শিক্ষা-শিবির খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সবই বে-সরকারী, তবে সরকার হইতে নিয়মিত সাহায্য দেওয়া হয়। মাথাপিছু মাসিক খরচ চার পাউণ্ড। এই খরচের অর্ধেক সরকার সাহায্যরূপে দান করিয়া থাকেন, আর বাকী অর্ধেক শিক্ষার্থিগণ নিজেরা বহন করে। ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ। এই-সব প্রতিষ্ঠানে যাহারা যোগদান করে, তাহাদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই কৃষিজীবী।

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিপল্‌স্ হাই স্কুলগুলিতে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি কিসে সাধারণ কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও বিশেষ কোন বক্তৃতা, প্রচার বা আলোচনা এখানে করা হয় না। কিন্তু তথাপি কৃষক-সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই এই প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। পিপলস্ হাইস্কুলগুলিতে প্রধানতঃ ইতিহাস ও সাহিত্য এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, দেহচর্চা,

এবং মেয়েদের জন্য সেলাই শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন ডেনমার্কের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—জাতির মানসিক উৎকর্ষ-সাধন। আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষক ও শ্রমজীবীরা চার-পাঁচমাস-কাল একত্র বাস করিয়া পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করে, তাহাই তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে উন্নততর ও দৃঢ়তর করিয়া তোলে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একটা সুস্থ ও সুখকর পারিবারিক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়। যে যে বিষয়ের চর্চা হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা কি-পরিমাণ শিক্ষা বা জ্ঞান প্রদত্ত হইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শিক্ষার্থীর কতটা মানসিক পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ সাধিত হইল, তাহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগাইয়া তোলাই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আদর্শ ও উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষাব্যবস্থার যে মূলগত ত্রুটি বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান ব্যাধি, তাহা হইতে ডেনমার্কের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা হইয়াছে। পিপল্‌স্ হাই স্কুল-আন্দোলনের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে, আদর্শবিহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় উন্নতিসাধন হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষভাবে কৃষি, শিল্প বা অন্য কোন কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলেও পিপল্‌স্ হাই স্কুল-আন্দোলনের ফলেই দেশের কৃষি ও শিল্প-সম্পদের অপরিমিত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানই শক্তি এবং জানিবার স্পৃহাই জ্ঞানলাভের মূল উৎস। এই উক্তির তাৎপর্য ডেনমার্কের পিপল্‌স্ হাই স্কুল-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুসৃত কর্ম্মপন্থার ভিতর দিয়া ইহা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ডেনমার্কের খনিজ বা শিল্পসম্পদ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় এই ক্ষুদ্র দেশটি ক্রমশঃই হীনবল হইয়া

পড়িতেছিল। বহিরাগত দ্রব্য-সম্ভারে ডেনমার্কের বাজার ছাইয়া গিয়াছিল। দেশে উৎপন্ন জিনিসপত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ডেনমার্ক পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে পিপল্‌স্‌ হাই স্কুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষক-সম্প্রদায় দেশের কৃষি ও বাণিজ্য-সম্পদের উন্নতি-বিধানে যত্নবান ও সচেষ্ট হইল। আজ কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডেনমার্ক শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষককুলের আর্থিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ফলে কৃষক-সম্প্রদায় আজ এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রেও এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহারাই আজ ডেনমার্কের ভাগ্যনিয়ন্তা।

ডেনমার্কে বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির মূলে প্রেরণা সঞ্চার করিতেছে দেশের জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি।

জনশিক্ষায় লাইব্রেরির স্থান

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত দেশসমূহে লাইব্রেরির সাহায্যে জনশিক্ষা-প্রচারের বিপুল আয়োজন ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইলেও যদি সেগুলি জনসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য না হয়, তবে তাহার অধিকাংশই অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। একখানা ভাল বই লিখিত হইল, কিন্তু যদি তাহা দশজনের মধ্যে প্রচলিতই না হইল, তবে তাহার মূল্য কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গ্রন্থের অবস্থা এইরূপ—

> "পাষাণগাঁথা প্রাসাদপুরে আছেন ভাগ্যবন্ত
> মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চহাজার গ্রন্থ।

সোনার জলে দাগ পড়ে না খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।”

পাঠকশ্রেণীর খুব কমসংখ্যক লোকই বই কিনিয়া পড়ে, অথবা বই কিনিতে সক্ষম। যে বেশীসংখ্যক লোক বই কিনিয়া পড়িতে অপারগ, তাহারাও যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে অথবা বিনা ব্যয়ে বই পড়িতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে পারে না। আবার একখানা বই কেবল একজনমাত্র পাঠকের কাজেই লাগিল, অন্য দশজন তাহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইল না—এই অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। লাইব্রেরির প্রধান কাজ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার ধনিদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। শহর হইতে দূরে নিভৃত পল্লীবাসীও যাহাতে পড়িবার সুযোগ পায়, লাইব্রেরি-আন্দোলন সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে চায়। জগতের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত সর্বসাধারণের পরিচয় ঘটানই লাইব্রেরির প্রধান কাজ। জনশিক্ষা-প্রসারের এত বড় সহায়ক আর দ্বিতীয়টি নাই।

লাইব্রেরি-আন্দোলনের সাফল্য দ্বারা কিরূপে একটা বিশাল ও নানা-সমস্যা-সঙ্কুল দেশে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় সোভিয়েট রাশিয়ায়। প্রাক্-বিপ্লব-কালের জার-শাসিত রাশিয়ার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনায় বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী প্রবল অভিযান পরিচালিত হয়, তাহার ফলে মাত্র চার বৎসরের মধ্যেই চার কোটি নরনারীকে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তোলা হয়। জনশিক্ষা-আন্দোলনের এই বিরাট্ সাফল্য অর্জিত হইয়াছে, দেশব্যাপী প্রায় লক্ষাধিক ক্লাব ও লাইব্রেরির সাহায্যে। এই লক্ষাধিক গ্রন্থাগারের আবার প্রায় সত্তর হাজারই পল্লী-অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯১২-১৭ সনে সমগ্র রাশিয়ায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা ইত্যাদির সংখ্যা ছিল ৮, ৬০,৮০,০০০ আর

কেবল ১৯৪০ সনেই ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,১০,০০,০০০। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় নিরক্ষরতা-সমস্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে, তাহার সংখ্যা প্রায় ২৫০০। এইসব গ্রন্থাগারের বেশির ভাগই স্থানীয় চাঁদার টাকায় স্থাপিত ও পরিচালিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব গ্রন্থাগার কলিকাতা পৌরসভা (Corporation), জেলা বোর্ড (District Board) ও মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যও পাইয়া থাকে। এই ২৫০০ গ্রন্থাগারের মধ্যে তিনশতেরও বেশি এক কলিকাতা শহরেই অবস্থিত। প্রায় আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০৬টি কলেজ-সংলগ্ন লাইব্রেরি রহিয়াছে। কিন্তু তাহা জনসাধারণের ব্যবহার্য নহে। ইহা ছাড়া আরও ষাটটি ইন্‌স্টিটিউট বা গবেষণাগার-জাতীয় লাইব্রেরি আছে, যথা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় লাইব্রেরি (National Library) ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও আপামর জনসাধারণের ব্যবহারে আসে না। কাজেই সমগ্র প্রদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ধরিয়া লইতে হয় ২৫০০। জনসংখ্যার অনুপাতে ২৫০০টি গ্রন্থাগার নেহাত অকিঞ্চিৎকর। আবার এইসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই পাঠাগার (Reading room)-বিহীন lending library; অর্থাৎ এইসব লাইব্রেরি হইতে বই নেওয়ার ব্যবস্থামাত্র আছে, কিন্তু লাইব্রেরি গৃহে বসিয়া পড়িবার সুবিধা নাই। এইসব সাধারণ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের অধিকাংশই নাটক-নভেল-শ্রেণীর,—জনশিক্ষার পরিপোষক নানাবিষয়ক সহজ পুস্তকাদির সংখ্যা খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশ হাজারের অধিক এবং শহরের সংখ্যা প্রায় ৯০টি। যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি স্থাপন করিয়া সাধারণের উপযোগী পুস্তক-পত্রিকার ব্যাপক প্রচলন ভিন্ন দেশে

জনশিক্ষার প্রকৃত প্রসার হইতে পারে না। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা-অনুযায়ী জিলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং পল্লীপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলা হইতেছে।

আমাদের দেশে লাইব্রেরিগুলিকে জনপ্রিয় ও কার্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় বরোদা রাজ্যে। ১৯০৭-০৮ সনে তদানীন্তন মহারাজা আমেরিকায় গিয়া তথাকার লাইব্রেরিগুলির গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহারই উদ্যম ও অর্থানুকূল্যে বরোদা রাজ্যে লাইব্রেরি-পরিচালনার জন্য একটি ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেণ্ট খোলা হয়। এই বিভাগটির সংগঠন ও সুপরিচালনার জন্য মহারাজা আমেরিকা হইতে মিঃ বর্ডেন (Borden) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া আসেন। এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে বরোদায় একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপিত হইল। কেন্দ্রীয় পাঠাগারে বিনা খরচায় সর্ব-সাধারণের প্রবেশাধিকার স্থাপিত হইল এবং ইহার অধীনে অনেকগুলি শাখা-প্রতিষ্ঠান (Sections) খোলা হইল, যথা—সংবাদপত্র-পাঠকক্ষ, অনুসন্ধান-শাখা (Reference), গৃহে বই লইয়া যাইবার ব্যবস্থা, মহিলা-বিভাগ, শিশু-বিভাগ, খোলা তাক (Open shelf)-বিভাগ, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-বিভাগ ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। পাঠকেরা গড়ে প্রতিদিন পাঁচশত বই লাইব্রেরি হইতে পড়িবার জন্য লইয়া যায়। মহিলা ও শিশু-বিভাগ দুইটির বন্দোবস্ত খুবই প্রশংসনীয়। মহিলা-বিভাগের নিয়মিত পাঠিকা-সংখ্যা ১১৪০। শিশু-বিভাগটি বরোদায় একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। বৎসরে প্রায় চল্লিশহাজার শিশু-সদস্য এই বিভাগের নানাবিধ কার্যকলাপে যোগদান করে। সুসজ্জিত হলঘরে শিশুরা খুশিমত স্বাধীনভাবে পড়াশুনা বা ক্রীড়াকৌতুক করিবার অবাধ সুযোগ পায়।

বরোদার মহারাজই প্রথম এদেশে লাইব্রেরি-প্রদর্শনীর আয়োজন

করেন এবং ওয়েম্‌ব্‌লি (Wembley), রোম (Rome) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রতিনিধি ও দর্শনীয় পুস্তক-পত্রিকা (Exhibits) প্রভৃতি প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পরিচালনাধীনে কতকগুলি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে। ছয়শতেরও অধিক চলমান বাক্সে বা পেটিকায় বৎসরে প্রায় ত্রিশহাজার বই বারহাজার পাঠক-পাঠিকার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তিনশত উপকেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফত এই চলমান পুস্তক-পেটিকাগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। পাঠাইবার যাবতীয় খরচ সরকার বহন করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির বিভিন্ন বিভাগের সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনার জন্য যথেষ্টসংখ্যক কর্মচারী ও কর্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন গ্রাম বা শহরের অধিবাসীরা চাঁদা তুলিয়া মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করিতে পারিলেই রাজ-সরকার হইতে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ দিয়া একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বরোদার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি-পরিকল্পনার অনুরূপ একটি পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারও বিবেচনা করিতে পারেন। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যসূচীর একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া গেল :

(১) শিক্ষা-অধিকর্তার (Director of Public Instruction) অধীনে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির হাতে দেশের যাবতীয় সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরির নিয়ন্ত্রণ-ভার ন্যস্ত থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেবির মারফত অন্যান্য লাইব্রেরিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে।

(১) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির অধীনে থাকিবে জেলা লাইব্রেরি, জেলা লাইব্রেরির অধীনে মহকুমা লাইব্রেরি এবং মহকুমা লাইব্রেরির অধীনে থানা এবং থানার অধীনে থাকিবে ইউনিয়ন ও গ্রামের লাইব্রেরি। এইভাবে সমগ্র দেশব্যাপী একটি বহু শাখা-প্রশাখা-সংবলিত লাইব্রেরি সার্ভিস (Library Service) গড়িয়া উঠিবে।

(৩) জেলা, মহকুমা ও থানা প্রতিষ্ঠানগুলি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সংগঠন ও পরিচালনা করিবে।

(৪) ইংলণ্ডের ন্যাশনাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরির আদর্শে ইহার পরিচালনায় একটি জাতীয় পুস্তক-তালিকা (National Catalogue of Books) প্রস্তুত হইবে। এই তালিকায় যে-কোন পুস্তক-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ইহাতে বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও গবেষণারত ছাত্রমাত্রেই অশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি হইবে একটি কপি-রাইট (copy right) লাইব্রেরি, অর্থাৎ দেশের যাবতীয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তকই এখানে সংগৃহীত হইবে।

(৬) প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ ও নানা গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশ হইবে ইহার অন্যতম কার্য।

(৭) দেশের সর্বত্র লাইব্রেরি-প্রদর্শনী, বক্তৃতা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য আধুনিক উপায়ে প্রচারকার্য দ্বারা লাইব্রেরি-আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলাও হইবে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কাজ।

প্রত্যেক গ্রাম্য গ্রন্থাগাবটিকে বয়স্ক-শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা খুব কঠিন কাজ নহে। লাইব্রেরির সংলগ্ন একটি পাঠকক্ষ (reading room) রাখিতে হইবে। এই পাঠকক্ষটি হইবে জনশিক্ষার কেন্দ্র। প্রতি সন্ধ্যায় সংবাদপত্র-পাঠের ব্যবস্থা থাকিলে স্বভাবতঃই এখানে জনসমাগম হইবার কথা। ইহা ছাড়া অন্যপ্রকার নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারাও গ্রন্থাগারটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। স্থানীর বিদ্যালয় অথবা গ্রন্থাগারে বয়স্ক-শিক্ষার কেন্দ্র খোলা ভিন্ন আপাততঃ অন্য কোন অধিকতর সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। কাজেই জনশিক্ষা-পরিকল্পনায় সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে উপযুক্তপরিমাণ আর্থিক সাহায্যদান এবং বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনা করিবার কথা চিবেচিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-সংগঠন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় হাত দেন ১৯৫০-৫১ সালে। সে বৎসর ১,০৬,১০০ টাকা সরকার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ও প্রয়োজনীয় আসবাব-ক্রয়ের জন্য এককালীন সাহায্যরূপে মঞ্জুর করেন। সেই সঙ্গে সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা নিকটবর্তী পাঠকেন্দ্র এবং গ্রন্থাগার-কেন্দ্র-স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। এগুলি কেবলমাত্র সাক্ষর ব্যক্তিদের জন্যই—যাহারা সবেমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল—এই আট বৎসরে এ বাবদে যে অর্থ সাহায্য করা হয় তাহার পরিমাণ ৯,৪৩,১০০ টাকা; ইহাব দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নবপ্রতিষ্ঠিত পাঠকেন্দ্রগুলি উপকৃত হয়। উল্লিখিত অর্থ-সাহায্য গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পাঠকেন্দ্র ও গ্রন্থাগাবেব জন্য। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের জন্য এই অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

অর্থ-সাহায্য-মঞ্জুরির জন্য রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। সংক্ষেপে সেগুলির শ্রেণীবিভাগ হইল ঃ

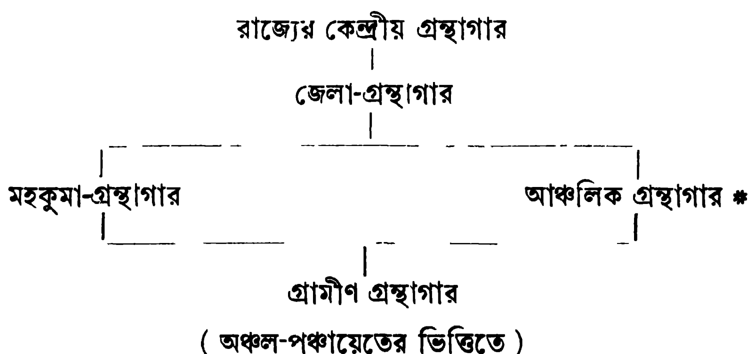
প্রথম শ্রেণী ॥ (ক) প্রধানতঃ রেজেস্টারীকৃত সংস্থা, (খ) অনুমোদিত কার্যকরী সমিতি দ্বারা পরিচালিত, (গ) নিজস্ব ভবনে বা ভাড়া-করা ভবনে প্রতিষ্ঠিত এবং পাঠকক্ষ-যুক্ত, (ঘ) দশহাজার বা তদধিক-সংখ্যক পুস্তক আছে, (ঙ) তিন হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ব্যয়-সমন্বিত, (চ) হিসাবপত্র ঠিকভাবে রক্ষিত ও পরীক্ষিত, (ছ) নিয়মিত সদস্য-সংখ্যা দুইশত বা তাহার বেশি।

দ্বিতয় শ্রেণী ॥ (ক—গ) প্রথম শ্রেণীর মতই, (ঘ) তিনহাজার বা তদধিকসংখ্যক পুস্তক আছে, (ঙ) একহাজার টাকার বাৎসরিক আয়ব্যয়-সমন্বিত, (চ) প্রথম শ্রেণীর মতই, (ছ) নিয়মিত সদস্য-সংখ্যা একশত বা তাহার বেশি।

তৃতীয় শ্রেণী ॥ ছোট ছোট গ্রাম্য গ্রন্থাগার—(ক) পাঠকেন্দ্রের ব্যবস্থা-যুক্ত, (গ) পাঁচশত বা তদধিকসংখ্যক পুস্তক আছে, (ঘ) তিনশত টাকার বাৎসরিক আয়ব্যয়-সমন্বিত, (ঙ) হিসাবপত্র ঠিকভাবে রক্ষিত ও পরীক্ষিত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সুরু হয়। এই সময় হইতে পরিপূরক অর্থমঞ্জুরি ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যায়। রাজ্যসরকার ও ভারত সরকার—উভয় সরকারই অর্থসাহায্য-দানে স্বীকৃত হইলেন ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় লওয়ার পর গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-ব্যবস্থা এইভাবে সাজানো হইয়াছে:



১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্য সরকারের বাজেটে (বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দে) গ্রন্থাগার-উন্নয়ন ও শিক্ষা বাবদ ৪৮,৭২,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-পরিকল্পনার মূল-কেন্দ্র-স্বরূপ এবং পরিচালনা ও যোগাযোগ-রক্ষাকারী সংস্থারূপে কাজ করিবে। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-স্থাপনের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এমারেল্ড বাওয়ার-এ একটি

* বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত এলাকা ও উন্নয়ন-ব্লক-স্থিত গ্রন্থাগার।

বড় পুরাতন ভবন লওয়া এবং তাহার সংস্কারসাধন করা হইয়াছে; এখানেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য নিম্নরূপ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ঃ

(ক) গ্রন্থ-ক্রয় বাবদ—১,৫০,৫০০ টাকা (প্রথম কিস্তি)।

(খ) আসবাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাবদ—১,০০,০০০ টাকা (প্রথম কিস্তি)।

(গ) ভবন-সংস্কার বাবদ—১,৫০,০০০ টাকা।

(ঘ) একটি মোটর-ভ্যান বাবদ—২৫,০০০ টাকা।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য একজন ডিরেক্টর, একজন গ্রন্থাগারিক, চারজন সহকারী গ্রন্থাগার-কর্মী, দশজন সহকারী এবং কেরানি ও নিম্নতন কর্মী নিয়োগ করা হইবে। ইতোমধ্যে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক ও জনকয়েক কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নীচেব ধাপেই জেলা-গ্রন্থাগার। উনিশটি জেলা-গ্রন্থাগার আজ পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। পনেরটি জেলার জন্য একটি এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনা—অপেক্ষাকৃত বড় এই জেলাগুলির জন্য অতিরিক্ত চারটি--মোট উনিশটি জেলা-গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

চব্বিশ-পরগনার জন্য তিনটি জেলা-গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। কেননা, এই জেলা আয়তনে ও লোকসংখ্যার হিসাবে বৃহত্তম। বর্তমানে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই কাজ সুরু করিয়াছে।

জেলা-গ্রন্থাগার-পরিকল্পনায় অর্থসাহায্য করা হইয়াছে এইভাবে—

(ক) গ্রন্থাগার-ভবন বাবদ—৭৮,০০০ টাকা।

(খ) গ্রন্থ-ক্রয় বাবদ—১২,০০০ টাকা (প্রথম কিস্তি)।

(গ) আসবাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাবদ—১৫,০০০ টাকা (প্রথম কিস্তি)।

(ঘ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বাবদ—২৫,০০০ টাকা।

মোট ১,৩০,০০০ টাকা।

জেলা-গ্রন্থাগারের কর্মী-সংখ্যা ও বেতনের হার নিম্নরূপ :

(ক) গ্রন্থাগারিক—মাসিক বেতন ২৫০ টাকা।
(খ) গ্রন্থাগার-কর্মী, তুইজন— „ ৭৫ „
(গ) সহায়ক-কর্মী, তুইজন— „ ৬০ „
(ঘ) মোটর গাড়ী-চালক— „ ১২৫ „
(ঙ) গাড়ী-সাফাইকারী— „ ৫০ „
(চ) দারোয়ান— „ ৫০ „
(ছ) রাত-পাহারাদার— „ ৫০ „
(জ) পিওন— „ ৫০ „
(ঝ) দফ্তরি— „ ৫০ „
(ঞ) গ্রন্থ ও পত্রিকা-ক্রয় বাবদ—মাসিক ৩০০০ টাকা।
(ট) নৈমিত্তিক ব্যয় বাবদ— „ ৪০০০ „

কর্মচারিগণ এখন নির্দিষ্ট হারে বেতন পান, কিন্তু ইঁহাদের জন্য মাহিনার হার-মঞ্জুরির কথা বিবেচিত হইতেছে।

জেলার মধ্যে সকলপ্রকার গ্রন্থাগার-আন্দোলনে যোগাযোগ রক্ষা করিবে জেলা-গ্রন্থাগার।

জেলা-গ্রন্থাগারের নীচের ধাপ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। ইহার কাঠামো জেলা-গ্রন্থাগারের অনুরূপ। ইহার কাজ সাত-আট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রামের অভ্যন্তর-ভাগে স্থাপিত শাখা-গ্রন্থাগারগুলি যুক্ত আছে। মোটরগাড়ী দিয়া ঐসব দূর তুর্গম এলাকায় বই পাঠানো হয়। এখন পর্যন্ত একশত কুড়িটি শাখা-গ্রন্থাগার-সমেত চব্বিশটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের ভবন বাবদ ২৫,০০০ টাকা, গ্রন্থ-বাবদ ৮,০০০ টাকা (প্রথম কিস্তি) ও আসবাবপত্র বাবদ ৮,০০০ টাকা ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন সাইকেল-পিওন এখানে নিয়োগ করা হয়।

গ্রামের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছোট ছোট শাখা-গ্রন্থাগার গ্রামেরই স্বেচ্ছা-কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অনুরূপ কাঠামো-যুক্ত দুইটি বিশেষ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বাণীপুর ও কালিম্পঙে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। সন্নিহিত অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের গভীর ও ব্যাপক প্রয়াসের অঙ্গস্বরূপ এই দুইটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি জেলা-গ্রন্থাগারের কাজের ভিত্তিস্থল। গ্রাম-এলাকায় প্রতি থানায় একটি করিয়া মোট ৪৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আজ পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় হয় একটি পুরাতন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন করা হয়, নয়ত একটি গ্রন্থাগার নতুনভাবে স্থাপন করা হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নরূপ-পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়:

গ্রন্থাগার-ভবন—৫০০০ টাকা (সরকারী সাহায্য ৩০০০ টাকা ও স্থানীয় সাহায্য অন্ততঃ ২০০০ টাকা); বই ও আসবাবপত্র—১০০০ টাকা (গোড়ায়)—মোট ৬০০০ টাকা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মী দুইজন ও গ্রন্থাগারিক একজন (বেতন মাসিক ৭৫ টাকা হিসাবে), সাইকেল পিওন একজন (বেতন মাসিক ৪০ টাকা), আপিস-খরচ—মাসিক ৫০ টাকা।

জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার বহন করেন, কিন্তু সংগঠন ও পরিচালনা-ভার স্থানীয় কর্মী সমিতির উপর ন্যস্ত করা হয়।

ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতকগুলি প্রাচীন এবং খ্যাতিযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থাগারকে এককালীন বা নিয়মিত বা উভয় ধরনের অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত এইসব প্রাচীন গ্রন্থাগারের কর্ম-সম্প্রসারণে সাহায্য করাই সরকারের উদ্দেশ্যে। এ-গুলির নাম (১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা; (২) উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী; (৩) রামমোহন লাইব্রেরি,

কলিকাতা ; (৪) বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী ; (৫) পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা-সমিতি, কলিকাতা ; (৬) বজবজ সাধাবণ পাঠাগার, চব্বিশ পরগনা ; (৬) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরি, খিদিরপুর ; প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হল ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারিক-শিক্ষা-কোর্স পরিচালনার জন্য তিনটি সংস্থাকে নিম্নরূপ বাৎসরিক অর্থ-সাহায্য দিয়া থাকেন :

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১২০০০ টাকা।

(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি—২০০০ „ ।

(গ) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সমিতি—১৫০০ টাকা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাবদ ও রাজস্ব-খাতে আরো অর্থ পাওয়া গেলে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যসরকার গ্রন্থাগার-পরিকল্পনার সম্প্রসারণ করিবেন এইভাবে—

(ক) শহরাঞ্চলে ও মহকুমায় গ্রন্থাগার-স্থাপন ;

(খ) শহর-এলাকায় সমাজশিক্ষা-পরিকল্পনানুসারে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-স্থাপন ;

(গ) প্রতিটি গ্রাম, থানা এবং সম্ভব হইলে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েতে আরো বেশী সংখ্যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার-স্থাপন ; এবং

(ঘ) গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-পরিকল্পনার সামগ্রিক পরিচয় হইতে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি যে, সরকার রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার-স্থাপনে তথা লোকশিক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছেন।



শিক্ষকের গুণপনা ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

বয়স্ক-শিক্ষণে সফলতা-লাভ বড় আয়াস-সাপেক্ষ এবং কতকগুলি বিশেষ গুণ না থাকিলে সফল হইবার আশা সুদূরপরাহত। তবে গুণপনার বহর দেখিয়া নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; একজনের সকল গুণ না থাকিলেও অন্যের সাহায্যে বয়স্ক-শিক্ষালয়গুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

১। **কথকতা**—কোন বিষয় বেশ মনোরম গল্প করিয়া বলিতে পারে-গ্রাম্য সান্ধ্য বৈঠকেব জন্য এইরূপ একজন লোক যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি হইতে শিক্ষাপ্রদ গল্পগুলি বেশ মনোরম ভাষায় বলিলে সান্ধ্য মজলিস শীঘ্র জমিয়া উঠিবে। সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর তামাক খাইতে খাইতে মনোরম পুরাণকথা দেহের ক্লান্তি ঘুচাইতে সাহায্য করিবে এবং মনে শান্তি আনিবে। তাহার পর দেহ ও মন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে লেখাপড়া আরম্ভ করা সহজ হইবে।

২। **গানের ব্যবস্থা**—শিক্ষকের গান গাহিবার ক্ষমতা থাকে ভাল, তাহা না হইলে গ্রাম হইতে কোন একজন এইরূপ গুণী ব্যক্তিকে যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক বা কীর্তনাদি গান লোকের মনে আনন্দের খোরাক যোগাইবে। মন সরল হইলে পড়াশোনা শেখা গুরুভার-বোধ হইবে না। একটা খোল বা হারমোনিয়াম যোগাড় করা আজকাল অতি অজ-পল্লীগ্রামেও সম্ভব। সুর-তাল-যোগে সমবেত কণ্ঠে গান বা স্তবাদি-পাঠে শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই হইবে।

৩। **খবরের কাগজের সারাংশ পড়িয়া শুনান**—আজকাল সকলেই দেশ-বিদেশের খবর শুনিতে চায়। এই আগ্রহের ঠিকমত সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে শুষ্ক ইতিহাস ও নীরস ভূগোল-পাঠ সরস হইয়া উঠিবে। নিত্য খবর শুনাইবার সময় তৎসম্পর্কীয় মানচিত্র

খুলিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিয়া সে স্থানের উপযোগী কিছু গল্প করিয়া শুনান প্রয়োজন। কৌশলে খবর শুনাইতে পারিলে ইতিহাস, ভূগোলাদি-বিষয় আর পৃথকভাবে পড়াইতে হইবে না। এই বক্তব্যটি একটু বিশদ করিয়া বুঝান দরকার।

যখন ভারতীয় বা রাষ্ট্রীয় সভার উপনির্বাচন হইয়া গেল, তাহার খবর খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। কোন্ দলের লোক জিতিল, তাঁহার দলের মতামত কি, নির্বাচন কিরূপভাবে হয়, ভোট কাহাকে বলে, ভোট কেমন করিয়া দিতে হয় এবং ভোটগণনা কেমন করিয়া করা হয়, ভোটপত্র বা ব্যালট-পেপার ও ব্যালট বাক্স কি, ইত্যাদি নির্বাচন-সংক্রান্ত বহু কথা গল্প করিয়া শুনাইলে স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হইবার যোগ্যতা বাড়ে।

পৃথিবীর কোন অংশে যুদ্ধের কালো মেঘ উঠিতে দেখা গেল। মানচিত্র খুলিয়া যুযুৎসু উভয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিচয়, রাজনৈতিক মতামত, বিরোধের কারণ ইত্যাদি গল্প করিয়া শুনাইলে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বাড়িবে। বই পড়াইলে পড়াটা গুরুভার হইয়া উঠিবে, কিন্তু নিত্যকার সংবাদ পরিবেশন করিবার কৌশলে উহা মিষ্ট লাগিবে।

খবরের কাগজে দেখা গেল সিঙ্গাপুরে ইটালি হইতে ১০,০০০ টন চাউল চালান গিয়াছে। মালয়ে কেন খাদ্যের অভাব হয়, সেখানে কাহারা চাউল খায়, সেখানে কিসের চাষ হয়, এবং কি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়; পৃথিবীর কোথায় কোথায় ধানের চাষ হয় এবং কোথায় বিঘা প্রতি কত মণ চাউল পাওয়া যায়—এই খবরগুলি দিলে গ্রাম্য লোকেরা আনন্দ ত পাইবেই, তদুপরি তাহাদের কূপমণ্ডূকতা ঘুচিবে এবং তাহারা গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিবে। এই সূত্রে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইটালিতে বিঘায় গড়ে ধান হয় ২০ মণ, জাপানে হয় ১৫ মণ, মিশরে হয় ১৪ মণ, আমেরিকায়, হয় ১০ মণ, শ্যামদেশে হয় ৬ মণ এবং ভারতে হয় গড়ে ৪৷৷০ মণ। নানাদেশে নানাপ্রকার সার-ব্যবহারের

ফলে কোন্ কোন্ দেশ বিঘা প্রতি ফলন কেমন করিয়া বাড়াইল ইত্যাদি বিষয় এই সূত্রে বলিলে তাহাদের এ বিষয়ে জ্ঞান বাড়িবে।

সুকৌশলী শিক্ষক যদি মন দিয়া খাটেন, তাহা হইলে এক খবরের কাগজের সাহায্যেই গ্রামবাসীকে সুযোগ্য নাগরিকে পরিণত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগিবে না। ঘটনাবহুল পৃথিবীতে এত বিচিত্র ঘটনা নিত্যই ঘটিতে থাকে যে, সেইগুলিই যদি মুখরোচক ও বোধগম্য করিয়া পরিবেশন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড়দিগকে ধারাপাত ও লেখাপড়ার বই ছাড়া আর কোন বই পড়াইবার দরকার হইবে না। তবে শিক্ষক মহাশয়কে পড়াশুনার সুযোগ দিতে হইবে এবং নানা বিষয়ে নানা পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরির জন্য যোগান দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

৪। **শিক্ষকের চিত্রাঙ্কনের হাত থাকিলে ভাল হয়।** তবে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা অবশ্যপাঠ্য নয় বলিয়া আজকাল বিদ্যালয় হইতে তাহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই আজকালকার ছেলেদের মোটামুটি ছবি আঁকা আসে না। বয়স্ক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে তালিম দিবার সময় চিত্রাঙ্কন (drawing) অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। দিনকতক অভ্যাস করিলে মোটামুটি ছবি আঁকিবার যোগ্যতা প্রত্যেক শিক্ষকই যে অর্জন করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন না তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন, ততদিন গ্রামে খোঁজ করিয়া এ বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে যোগাড় করিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। ইহার অভাবে কিছু প্রয়োজনীয় ছবি খবরের কাগজাদি হইতে কাটিয়া যোগাড় করিয়া রাখিলে পড়াইবারর সুবিধা হইবে। শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনীয় সংবাদ, ছবি বা প্রবন্ধ খবরের কাগজ হইতে কাটিয়া রাখিয়া ক্রমশঃ একটি সংগ্রহ-পুস্তক প্রস্তুত করিয়া লইলে তাঁহার শিক্ষাদান-বিষয়ে যোগ্যতা বাড়িবে।

৫। বাংলা লেখাপড়া ম্যাট্রিক পর্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। ম্যাট্রিক-পাশের ছাপ অপেক্ষা শিক্ষকের পড়াশুনা করিবার প্রবৃত্তি

অধিক বাঞ্ছনীয়। আজকাল না পড়িয়াও একটা ছাপ যোগাড় করার কৌশল অনেকেই জানেন। অতএব ছাপের উপর বেশী জোর দেওয়া ভাল হইবে না।

৬। **শিক্ষকের সরল মানসাঙ্কের খুব অভ্যাস থাকা প্রয়োজন**— বর্তমান ইংরাজী প্রথা অপেক্ষা আমাদের পুরাতন ধারাপাত ও মানসাঙ্কের সূত্রগুলি সহজে অনুধাবনযোগ্য এবং বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া মনে হয়। মানসাঙ্কের সূত্র কয়টি মনে থাকিলে সাধারণ ধারাপাতের সাহায্যে গ্রাম্য জীবনের যাবতীয় হিসাবের সমাধান অতি সহজেই করিতে পারা যাইবে।

৭। **স্বাস্থ্যবিদ্যা** (ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও পারিবেশিক)—এই বিষয়ে অনেক ছোট-বড় বই প্রকাশিত হইয়াছে। স্কুলের পরীক্ষায় ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্য-বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু আসলে কি অবস্থা দেখিতে পাই? ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য বা গ্রাম্য—কোন দিকেই স্বাস্থ্যের উন্নতি চোখে পড়ে না; বরং নানা পরিহার্য ও নিবার্য ব্যাধি-প্রপীড়িত গ্রাম্য সমাজ দিন দিন পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ, পড়ুয়ারা স্বাস্থ্যবিদ্যার চর্চা করে, কিন্তু স্বাস্থ্যের চর্চা বা আচরণ কিছুই করে না। আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবিদ্যা ব্যক্তিগত, পারিবেশিক বা গ্রাম্য ইত্যাদি বড় বড় কথা লোকে জানিত না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সদাচার-পালনে অভ্যস্ত করা হইত শৈশব হইতে। সদাচার-শিক্ষায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা ত ছিলই এবং এমন অনেক কিছু থাকিত, যাহা দ্বারা দেহের ও মনের সংস্কারও সাধন করা হইতে। মনের সংস্কার-সাধন ব্যতীত যে দেহের সংস্কারসাধন হইত পারে না, একথা ভুলিলে চলিবে না।

শিষ্টাচার-শিক্ষার পারিবারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার এমন-ভাবে শৈশব হইতে মনে গাঁথিয়া দেওয়া হইত যে, প্রতি ব্যক্তিই আপনাকে বৃহৎ সমাজের একটা অঙ্গমাত্র মনে করিত, বর্তমান কালের মত একটা অনিষ্টকর স্বার্থপর স্বতন্ত্রভাব মনে ফুটিবার অবকাশ পাইত

না। এই পুরাতন শিক্ষার মূল ছিল **"আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।"** বই মুখস্থ করাইয়া পাশ করাইবার প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাকে সদাচারী করিয়া সামাজিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলা ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজের প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল এই দিকে, সেইজন্য স্কুলে না গিয়াও তাহাদের সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার শিক্ষার অভাব হইত না।

৮। **পৌরবিদ্যা**—বর্তমানের নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক কিছু নূতন সমস্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতি প্রাচীন কালের ছোট সমাজে বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে শিক্ষা অতি অল্প-আয়াসসাধ্য ছিল, তহাই বর্তমান কালের বৃহৎ রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে নানা সমস্যার ফলে জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমষ্টিগত উদ্যোগ অধিক প্রয়োজন। ইহার জন্য চাই পৌরবিদ্যার মোটামুটি ধারণা ; বর্তমানে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত দায় ও দায়িত্ব কতখানি, তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রত্যেক অধিবাসীর থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৯। **বিজ্ঞান**—সাধারণ জীবনযাত্রার প্রয়োজনে বিজ্ঞান-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। যন্ত্রপাতির ব্যবহার-ব্যতিরেকে এই শিক্ষা দিতে হইবে। কেননা, যন্ত্রপাতির যোগাড় ও ব্যবহার কষ্টসাধ্য। আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুকৌশল ব্যবহারে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যই মোটামুটিভাবে জানিতে পারা যায়। এই দিক দিয়া বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গিয়া পঞ্চভূতের জন্ম। অতি প্রাচীন কালেই আর্য ঋষিগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, প্রাণের বিকাশ ও লীলার জন্য পাঁচটি ভূত বা উপাদানের প্রয়োজন। প্রথমটি মাটি, দ্বিতীয়টি জল, তৃতীয়টি সৌরতেজ, (আলো ও তাপ), চতুর্থটি বাতাস এবং পঞ্চমটি মাটির মধ্যে জল, সৌরতেজ ও বাতাস-চলাচলের জন্য শূন্যস্থান ও আকাশ। এই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে (combination) এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রাচীন পন্থায় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আলোচনা করিলে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় যথেষ্ট উপকার হইবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটির বিশ্লেষণ করা বহুমূল্য ল্যাবরেটরি-সাপেক্ষ, কিন্তু জিহ্বা ও চক্ষের সাহায্যে বিশ্লেষণ অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। মাটির রং দেখিয়া গুণাগুণ বিচার করিতে শেখা অতি সহজ ব্যাপার। একটি চার্টের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

তথাকথিত কুসংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার বিশেষ প্রয়োজন। কুসংস্কারগুলি কালের গুণে পরিত্যক্তের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে। একদিন সমাজ-ব্যবস্থায় ঐগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজিও উহাদিগের সংস্কার করিয়া রাখা চলে কিনা তাহা বিচার্য। বিশেষ বিচার না করিয়া কোন দেশাচার হঠাৎ ত্যাগ করা উচিত হইবে না।

প্রকৃতিতে কোন জিনিসই ফেলা যায় না। এক অখণ্ড ব্যবস্থায় একের আবর্জনা অন্যের খাদ্যে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতিতে অপচয় নাই, অভাবও নাই। এই প্রাকৃতিক নীতি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিতে শিখিতে হইবে। আমাদের মল-মূত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় আবর্জনা সারে পরিণত করিয়া জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইয়া অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায়। এ উপায়ে আবর্জনা-সমস্যার সমাধান করিয়া বাসগৃহগুলি আরও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলা চলে। এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়া রোগের জীবাণুর আশ্রয়স্থল নোংরা আবর্জনাকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করিয়া গ্রামগুলিকে সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের আকর করিয়া তোলা যায়।

আকাশ দেখিয়া জল-ঝড়ের আভাস পাওয়ার সাধারণ নিয়মগুলির সহিত পরিচয় থাকা দরকার। এবিষয়ে নানা জনের নানা অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। আমাদের দেশে প্রচলিত খনার বচনগুলি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। গ্রামের প্রাচীন লোকেদের নিকট হইতে এবিষয়ে বহু সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

চাষের সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন চাষীদের শিখাইবার জন্য যেরূপ

বিদ্যার প্রয়োজন, তাহা আমাদের বয়স্ক-শিক্ষণের শিক্ষকদের নিকট হইতে আশা করা অন্যায়। সকল দেশের চাষীরাই বড় গতানুগতিক। তাহাদের বহুকালের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করা ভুল। এই জ্ঞানকে অধিক ফলপ্রসূ করিবার জন্য বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক পথে পরীক্ষিত তথ্যগুলি উহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে। পড়ুয়াদিগের মধ্যে কেহ না কেহ আপন সামর্থ্যানুযায়ী পরীক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই অগ্রণী হইবে। সে যদি কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে, তখন সকলেই উহা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। এইরূপে ক্রমশঃ গ্রামের যে পতিত জমিগুলি বনজঙ্গলে পরিণত হইয়া মশা ও সাপের আশ্রয়ভূমি হইয়া গ্রামবাসীদিগের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, উহাই ফসলের ক্ষেতে পরিণত হইয়া মনুষ্য ও পশুর ক্ষুধার অন্ন যোগাইবে। এ-সকল বিষয়ে আমাদের সকলের যথেষ্ট করণীয় রহিয়াছে। চিত্র-প্রনর্শনী (Flim demonstration) দ্বারা এই উদ্দেশ্য অতি সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধ হইতে পারে।

১০। **ভূগোল**—গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষক মহাশয়েরা যদি ভূগোল শিখাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কর্মক্লান্ত পড়ুয়া দ্বিতীয় দিন আর পড়িতে আসিবে না। প্রথম প্রথম সাধারণের ব্যবহার্য বস্তু লইয়া আলোচনা করিতে করিতে খানিকটা ভূগোল পড়ান হইয়া যাইবে। ধরুন, একটি দেশালাইয়ের কাঠি লইয়া কত গল্পই না করা যায়! কোথায় কোথায় দেশালাইয়ের কাঠির উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায়? পূর্বে কিরূপ দেশলাই প্রস্তুত হইত এবং সেই দেশলাই ও আজকালকার নির্দোষ দেশলাইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? দেশলাইয়ের পূর্বে মানুষ কেমন করিয়া চকমকি দিয়া অগ্নি উৎপাৎদন করিত এবং রক্ষা করিত? দেশলাইয়ের মাল-মসলা এবং প্রস্তুতের কারখানার বিবরণ এবং জাপানে ইহা কেমন করিয়া কুটির-শিল্পে পরিণত হইয়াছে, আমাদের দেশে ইহা বৃহৎশিল্পের অন্তর্গত—ইত্যাদি বহু কথাই গল্পাকারে মনোরম করিয়া বলা চলে।

এইরূপ ভাবে বস্ত্র, কয়লা, ছাতা, লবণ প্রভৃতি আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস ধরিয়া উহাদিগের উৎপত্তি-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মরহস্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নানাকথা প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দেওয়া চলে। এই পথে ধীরে ধীরে জানা হইতে অজানা তথ্যে পড়ুয়াকে পৌঁছাইয়া দেওয়াই হইবে শিক্ষকের কর্তব্য।

কেমন করিয়া সমুদ্র হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া উহা ঝড়ের মুখে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে; তাহার পর বর্ষাকালে সেই পুঞ্জীভূত মেঘরাশি কেমন করিয়া বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে নামিয়া আসে; যে যে দেশে ঐ বৃষ্টি হয় সেই সেই দেশের 'বৃষ্টিধরা' ভূমি (Catchment area) হইতে নানা জলধারা মিলিত হইয়া কেমন করিয়া নদীর উৎপত্তি হয় এবং সেই নদী কেমন করিয়া নির্বিঘ্ন পথে নিম্নভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া কোনো নদীর সহিত মিলিত হয় বা সাগরসঙ্গম-অভিমুখে ধাবিত হয়; 'বৃষ্টিধরা' ভূমিতে অতিবৃষ্টি হইলে কেমন করিয়া নিম্নভূমির নদী-প্রবাহে পথের দুই পাশে প্লাবন উপস্থিত হয়; প্লাবনের ভালমন্দ পরিণতি, প্লাবন-রোধের পুরাতন উপায়, নির্বিচার বাঁধ ও তাহার অপকারিতা; প্লাবন-বন্ধের বর্তমান বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরি-কল্পিত বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া রচিত পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা এবং আমাদের দেশের দামোদর-পরিকল্পনার বিষয় মানচিত্র-সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

এলোমেলো পড়ানয় ক্ষতি নাই, পড়ান যদি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ভূগোল পড়াইবার প্রথম সূত্র হইল জানা তথ্য বা ঘটনা ধরিয়া অজানা তথ্যে ছাত্রকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয় সূত্র হইল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেশ-বিদেশের মানুষ, জীব-জন্তু, আচার-ব্যবহার, চাষবাস ইত্যাদির কথা গল্পাকারে সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করা।

দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগ নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে। ধরুন, গ্রামে কেহ তীর্থভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তিনি গল্প করিয়া পথের কথা বলিবেন এবং শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী মানচিত্র-সাহায্যে

তাঁহার গতিপথ দেখাইয়া দিতে থাকিবেন এবং যে-সকল অজানা কথার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে, সেইগুলি আপন সংগ্রহানুযায়ী যোগাইয়া দিবেন। গ্রামে এমন একজন আসিলেন—যিনি, ধরুন, সাগর-পারে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষকের কর্তব্য হইল তাঁহাকে গ্রাম্য বৈঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেশ-বিদেশের জীবনযাত্রার কথা শোনা। শিক্ষক যদি সজাগ ও সুকৌশলী হন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ নানা উপায়ে তাঁহার সান্ধ্য মজলিসটি শীঘ্রই আনন্দের হাট করিয়া তুলিতে পারেন।

১১। **ইতিহাস পড়াইবার সময়** বার, তারিখ, সাল কি অন্যান্য অর্থহীন খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর নির্ভর করা হইবে না। আমাদের দেশে ইতিহাস শিখাইবার এক অতি মনোরম রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কথক-ঠাকুরেরা সেই মান্ধাতার আমল হইতে পুরাণকথা মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় জনসাধারণের নিকট বলিয়া আসিতেছেন। আমাদের ইতিহাস সেই যুগের ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া পল্লবিত হয় বলিয়া এত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রোতা সে পুণ্যকাহিনী শুনিয়া কখনও হাসে কখনও কাঁদে। বিখ্যাত কীর্তিমান ব্যক্তির সহিত যুগকে বাঁধিয়া দিয়া আমাদের ইতিহাস লেখা হইত বলিয়া উহার নাম পুরাণকথা। রামায়ণ, মহাভারত ঐ মনোরম রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রীতিতে পাঠক বা শ্রোতাকে গোটাকতক ধ্বংসলীলার কাহিনী পড়াইয়া বা শুনাইয়া দিগ্বিজয়ীর চমকপ্রদ জীবনী মুখস্থ করান হইত না। আমাদের পুরাণের ব্যক্তি সে যুগে শ্রেষ্ঠ ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ। আমাদের শ্রীরামচন্দ্র পিতার মর্যাদারক্ষা করিবার জন্য নিজের সর্বস্ব বলি দিয়া কত দুঃখই না বরণ করিলেন! আমাদের শ্রীকৃষ্ণ শতধাখণ্ড ভারতে এক অখণ্ড রাষ্ট্রগঠনের জন্য যত না স্মরণীয়, ততোধিক স্মরণীয় দীনের আশ্রয় বলিয়া, গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। আমাদের বুদ্ধকে ধরিয়া সে যুগের ইতিহাস আজও উজ্জ্বল।

অশোকের দিগ্বিজয়ের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধের বাণী-প্রচারের অপূর্ব চেষ্টা আজিও দেশ-বিদেশের বুকে ও লোকের মনে আঁকা আছে। এই পথেই ইতিহাস শুনাইয়া শিখাইবার চেষ্টা হইলে ভালও লাখিবে এবং মনেও থাকিবে। দেশের ইতিহাস ব্যক্তি-বিশেষের খ্যাতিকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে; ইতিহাস বাক্তিবিশেষকে গড়ে না, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। বাক্তিবিশেষকে ভাল কবিয়া বুঝিলে সে যুগেব ইতিহাস যেরূপে বুঝিতে পারা যায়, অন্য আর কোনরূপেই সেরূপ বুঝিতে পারা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষকে লইয়া ইতিহাস গড়িলে উহা আমাদের সুখ-দুঃখভরা ঘরের কথার মত লাগে, তাই মনে থাকে; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য দিয়া বিচাব-বিশ্লেষণে পাণ্ডিত্যেব পরিচয় পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরের কথার মত মনকে স্পর্শ করে না।

১২। **আশুচিকিৎসা, সেবা ও পথ্য**—এসম্পর্কে গোটাকতক অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রয়োগ-যোগ্যতা সকলেরই থাকা উচিত। এ-সকল বিষয়ে খুব ছোট ছোট পুস্তিকা সহজ ভাষায় লিখিয়া ছাপাইয়া অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা থাকা ভাল। বিদ্যালয়ে বা সান্ধ্য বৈঠকে এ বিষয়ের কতকগুলি চার্ট সকল সময়েই টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত। চার্টগুলি দেখিলেই যাহাতে দর্শকের কিছু জ্ঞান হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

লোকশিক্ষায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার

স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যা আনুমানিক ত্রিশ কোটি। এই বিরাট্ জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ জন নরনারীই নিরক্ষর! শুধু তাহাই নহে, যেরূপ দ্রুতগতিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আগামী আদমসুমারিতে সমগ্র জনসংখ্যার সহিত নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যার অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির

দ্রুতগতির তুলনায় শিক্ষা বা আক্ষরিক জ্ঞানের অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক ভাবে মন্থর। প্রতি বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি দশ বৎসরে মোট বৃদ্ধি পায় তিন কোটিরও অধিক।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভর করে জনশিক্ষার প্রসারের উপর। ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রথমেই জনশিক্ষা-প্রসারে জাতিকে তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে এই অভিযানকে সফল করিয়া তোলা প্রয়োজন।

জনশিক্ষা-সমস্যাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা চলে. যথা—(১) নিরক্ষরতা-দূরীকরণ এবং (২) সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তার। দেশব্যাপী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত নিরক্ষরতার আমূল বিনাশ নাই। সুতরাং ইহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়াও অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নানা যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও প্রচারের সাহায্যে জনশিক্ষা-প্রসারের কাজ চলিতেছে। ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তীর্থস্থান-দর্শন, পালাপার্বণ, মেলা, যাত্রাগান, কীর্তন, তরজা, ব্রতকথা-পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবহমান কাল হইতেই জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ-বিতরণ ও শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল।

আজ দেশব্যাপী বহুশতাব্দী-সঞ্চিত অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, নিরক্ষরতা-দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও নানা আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প এবং বর্তমান জগৎ ও ভারত-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বিতরণ করিয়া উহাদিগের অজ্ঞতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস। একটা উন্নততর জীবনের মান বা আদর্শ তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা এবং

সমগ্র জাতির কৃষ্টির উৎকর্ষসাধন করাই সরকারী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

কি উপায়ে এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। সর্বাপেক্ষা সহজ স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ উপায়—**ছবি ও চার্টের** সাহায্যে শিক্ষাদান। চীনদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে: "A picture is worth a thousand words." সুন্দর ও সুকল্পিত চিত্রের দ্বারা কেবল যে অতি সহজে মানুষের মনে কৌতূহল সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহা নহে, চিত্রের মারফত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সাধারণ্যে বিতরণ করা যায়। **চার্ট** দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ছবি ও চার্ট খুব সুষ্ঠুভাবে অঙ্কিত না হইলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে চিত্রটিকে প্রকৃতই সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ হইতে হইবে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছবি আঁকিবার জন্য সুদক্ষ শিল্পীর সাহায্য আবশ্যক। ছবি ভাল হইলে অনেক সময় পুঁথি-পড়া অপেক্ষাও ইহার প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী হয়। ছবির ন্যায় **মানচিত্রও** জনশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রে দেশের কৃষিজাত প্রধান প্রধান শস্যের উৎপত্তিস্থান এমনভাবে দেখান সম্ভবপর যে, ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া মনে রাখা অপেক্ষা অতি সহজেই তাহা মনে রাখা যায়। ছবি, চার্ট ও মানচিত্রের ব্যবহার দ্বারা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে সজাগ ও তৎপর করিয়া তোলা হয়। মানুষ তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবিরাম অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালাভ করিতেছে। যে জিনিসটা মানুষ চোখে দেখে, সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা বা impression হয় খুব স্থায়ী ও বদ্ধমূল। বই পড়িয়া জ্ঞানলাভ অপেক্ষা স্বচক্ষে দেখিয়া যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার মূল্য ও স্থায়িত্ব হয় অনেক বেশী।

পূর্বে বক্তৃতা বা প্রোপাগাণ্ডায় **ম্যাজিক লণ্ঠনের** খুব ব্যবহার চলিত। ছোট একখানা স্লাইডের সাহায্যে বহুস্থানে বহুবার এবং

বহুগুণ বড় করিয়া একখানা ছবি ম্যাজিক লণ্ঠন-যোগে সাহায্যে বহু লোককেদেখান যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠন অপেক্ষাও উন্নততর যন্ত্র নির্মিত হইযাছে। এই যন্ত্রের নাম **ফিল্মস্ট্রিপ প্রোজেক্টার** (Filmstrip Projector)। ইহার ব্যবহারে সুবিধা এই যে, ইহা আকারে ছোট ও ওজনে হাল্‌কা—সহজেই বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। এই যন্ত্রে শ্লাইডের (slide) পরিবর্তে ফিল্ম (film) ব্যবহৃত হয় এবং শ্লাইডের ন্যায় বারবার ফিল্ম খুলিয়া ভরিতে হয় না। ফিল্মটি জড়াইয়া রাখিলে উহার ওজন একটি হাল্‌কা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের অধিক হইবে না।

আর একটি সহজ ব্যবহার্য যন্ত্র হইতেছে **এপিডায়াস্কোপ** (Epidiascope)। এই যন্ত্র স্কুল-কলেজে ব্যবহারের পক্ষে খুব উপযোগী। ইহা দ্বাবা ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠা, ছবি ও শ্লাইড প্রভৃতি বহুগুণ বড় করিয়া পর্দায় প্রতিফলিত করিয়া একসঙ্গে বহু লোককে দেখান যায়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আধুনিক যন্ত্র হইতেছে **ফিল্ম-প্রোজেক্টার** (Film Projector)। শিক্ষার প্রসারে বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র বা সিনেমার প্রভাব অসামান্য। মোটরযানের সাহায্যে সিনেমার যন্ত্রপাতি সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়া নিভৃত পল্লী-অঞ্চলেও চিত্র-প্রদর্শন সম্ভবপর। কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্যই নহে, দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিবার জন্য ফিল্ম-প্রোজেক্টারের ন্যায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল আর দ্বিতীয়টি নাই। ভারতের মত বিশাল ও অনুন্নত দেশে এই যন্ত্রটির বহুল ব্যবহার দ্বারা জনশিক্ষা-আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও প্রাণবান্ করিয়া তোলা যায়।

ফিল্ম-প্রোজেক্টার দ্বারা নির্বাক ও সবাক দুইপ্রকার চিত্রই দেখান যাইতে পারে। সাধারণ সিনেমায় ৩৫ মিলিমিটার প্রোজেক্টার ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ছবি ও কথা দুইই খুব স্পষ্ট ও বড় করিয়া দেখান ও শুনান যায়। কিন্তু ৩৫ মিলিমিটার যন্ত্রটি আকারে ও ওজনে বৃহৎ,

একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া খুব সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু ইহার ফিল্মগুলি দাহ্য। সুতরাং এই মেশিনটি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক। ১৬ মিলিমিটার প্রোজেক্টারই স্কুল ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের পক্ষে খুব উপযোগী এবং যন্ত্রটি আকারে ও ওজনে খুব বেশী বড় নহে,—সহজেই অকস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ (accessories) ও শক্তিউৎপাদক যন্ত্র (generator) সহ সর্বসাকুল্যে এই যন্ত্রের বর্তমান মূল্য অনধিক ৮০০০্ টাকা।

যেমন দর্শনেন্দ্রিয় তেমনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাও প্রতিনিয়তই মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিপোষক নানা যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করিয়া জনশিক্ষার পথ সুগম করিয়াছে। এবিষয়ে **গ্রামোফোনের** উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান যুগে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যে **রেডিও বা বেতারের** অপরিহার্যতাও সকলেই বিদিত আছে। ইহা ছাড়া যে-কোন বড় জনসভায় আজকাল **মাইক্রো-ফোনের** (microphone) সাহায্যে একের কথা বহু লোকে শুনিতে পায়। এই যন্ত্রটিও জনশিক্ষার প্রসারকল্পে খুব দরকারী।

দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক জনশিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইবে। এইসব কেন্দ্রে বা নৈশবিদ্যালয়ে কেবল যে বয়স্ক-বয়স্কাদিগকে সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়া সাক্ষর করিয়া তোলা হইবে তাহাই নহে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে হইবে গ্রামের নরনারীর সামাজিক মিলনকেন্দ্র, শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের আনন্দোচ্ছল সম্মেলন। এই কেন্দ্রের পরিবেশকে রীতিমত আকর্ষণীয় করিতে না পারিলে দিনের শেষে কর্মক্লান্ত গ্রামবাসীরা যে ইহাতে যোগদান করিতে আসিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

কাজেই প্রতি কেন্দ্রে আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের উপযোগী সাজসরঞ্জাম ও ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে। প্রতি কেন্দ্রে

একটি করিয়া গ্রামোফোন ও রেডিও রাখিলে ভাল হয় এবং কতকগুলি কেন্দ্রের জন্য একটি প্রোজেক্টার-সংবলিত মোটরভ্যান নিযুক্ত করিলে পালাক্রমে সমস্ত কেন্দ্রেই শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শন করা যায়। প্রত্যেক কেন্দ্রে সাক্ষর বয়স্ক-বয়স্কাদের পাঠোপযোগী পুস্তক ও পত্রিকার ছোটখাট একটি লাইব্রেরি রাখিতে হইবে। ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের আয়োজন করাও সমীচীন। সুদৃশ্য চিত্র, চার্ট ও ম্যাপ প্রত্যেক কেন্দ্রেই যথেষ্ট পরিমাণে রাখা উচিত। খেলাধূলা, গান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান দ্বারা কেন্দ্রটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। কেন্দ্রের নানা কাজের ভিতর দিয়া একটা সুস্থ সমাজ-জীবনের গোড়াপত্তন করিতে হইবে। কর্মক্লান্ত গ্রামবাসী যখন দিনান্তে একবার অবসর-বিনোদনের জন্য হইলেও সাগ্রহে এই কেন্দ্রে আসিতে চাহিবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে। কেন্দ্রের প্রতিটি কাজ হইবে সুন্দর, শিক্ষণীয় ও সরস। কেন্দ্র-পরিচালনার ভার যে কর্মীর উপর অর্পিত হইবে, তাঁহাকে এই কঠোর দায়িত্ব-পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পল্লী-জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

জনশিক্ষা বা জনকল্যাণকর যে কোন আন্দোলনের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও কোটি কোটি গ্রামবাসীর কথা। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ,—India lives in villages. সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫,৪৪,৬৯২টি এবং শহরের সংখ্যা ২,৪১৫। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২০ জন লোক শহরবাসী, বাকী শতকরা ৮০ জনই পল্লীবাসী। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে একদিকে শহরগুলির যেমন দিন দিন উন্নতিসাধন হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি অনাদর ও উপেক্ষায় পল্লীগুলি হইয়া পড়িতেছে হতশ্রী ও

মৃতপ্রায়। কিন্তু ইহা সত্বেও জাতীয় জীবনের প্রাণরস পল্লীর মৃত্তিকা হইতেই সঞ্চারিত হইতেছে। গ্রামগুলিকে বাদ দিয়া ভারতীয় জীবনের কোন ধারণা করাই চলে না। কাজেই ভারতের যে-কোন জন-আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইবে ইহার অগণিত গ্রামে। নাগরিক জীবনের নানা সুখ-সুবিধার আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া দলে দলে নরনারী গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরাভিমুখে চলিয়া আসিতেছে। ফলে পল্লীসমাজ ক্রমশঃ দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে এই যে, দেশের এক অকিঞ্চিৎকর অংশ—কয়েকটি মাত্র শহর—শিক্ষা, শিল্প ও সম্পদে যেন অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দেশের বাকী বিরাট্ অংশটির প্রাণহীন নিঃসাড় অবস্থা সমগ্র জাতীয় জীবনের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শহরে বসিয়া সভা-সমিতি স্থাপন এবং সদিচ্ছাপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পল্লী-উন্নয়ন বা পল্লী-সংগঠন করিবার সাধু প্রয়াস অনেকেই করিয়া থাকেন। এই সদিচ্ছার মূলে যে সব সময়েই আন্তরিকতার অভাব থাকে তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে প্রচার-বিজ্ঞপ্তির মহিমায় শহর হইতে যত সহজে সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যায়, নিভৃত ও অখ্যাত গ্রামাঞ্চল হইতে তাহা কদাচও সম্ভব হয় না এবং সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত কোন ব্যাপক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ যে মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া শহরবাসী কর্মী ও সংস্কারকগণ পল্লীসংগঠন-কার্যে অগ্রসর হন, তাহাতেই তাঁহাদের ব্যর্থতার বীজ নিহিত থাকে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর এবং আলোকপ্রাপ্ত শহরবাসীদিগকে গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জনসাধারণের প্রতি অনেকটা অনুকম্পা-মিশ্রিত মুরুব্বিয়ানার ভাব পোষণ করিতে দেখা যায় এবং এই উন্নাসিক মনোভাবই তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ড করিয়া দেয়। কর্মীরা প্রথমেই গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাহাদের নানা

বিষয়ে অজ্ঞতা এবং তাহাদের অগণিত কুসংস্কার প্রভৃতির তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। গ্রামবাসীরা স্বভাবতঃই শান্ত ও পরমতসহিষ্ণু। উপরন্তু বেশভূষায়, শিক্ষাদীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শহরবাসীদের তুলনায় তাহাদের নিজেদের দৈন্য ও হীনতা এতই স্পষ্ট ও প্রকট যে, তাহারা স্বভাবতঃই নিজেদের অনেকটা নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়াই মনে করে। কাজেই কেহ নিন্দাবাদ করিলেও তাহারা নির্বিবাদেই তাহা তাহাদের প্রাপ্য বলিয়াই মানিয়া লয়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ না করিলেও উপদেষ্টার সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী তাহাদের মনে কোনও রেখাপাত করিতে পারে না। কারণ, বদ্ধমূল সংস্কারের প্রভাব কাটাইয়া নূতন ভাবধারা গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে খুব সহজ নহে; সংস্কারক ও সংগঠনকারীর শত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা তাহাদের অভ্যস্ত পথেই চলিতে থাকে। চিরাচরিত প্রথার কঠিন প্রস্তর-প্রাচীরে সংস্কারের যাবতীয় তরঙ্গাঘাত নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম হয়ত বা কিছুটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং কোন কোন বিষয়ে কাজও কিছুদূর অগ্রসর হয়, কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই সব উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়িয়া যায়। ইহার মূল কারণ দুইটি,—প্রথমতঃ, কর্মীর আন্তরিকতার অভাব। শখের সংস্কারক সাজিয়া সাময়িক বক্তৃতা দ্বারা কাজ হাসিল করিবার চেষ্টায় চলিবে না। কর্মী যদি গ্রামবাসীর সহিত একাত্ম হইয়া, গ্রামের পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন, তবেই তাঁহার সংস্কার-চেষ্টা ফলবতী হইবে, নতুবা নহে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামবাসীর মনে প্রাচীন সংস্কারের বদ্ধমূল প্রভাব, অর্থাৎ কোন পুরাতন প্রথা বর্জন করিয়া নূতন কিছু গ্রহণ করিতে আপত্তি ও অনিচ্ছা। সংস্কারক ও কর্মীরা প্রথমেই একটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন। যত কিছু গ্রাম্য প্রথা বা আচার—তাহার সবই মন্দ, প্রাচীন সংস্কারের সব কিছুই বর্জনীয়—এই ধারণা লইয়াই ইঁহারা পল্লী-উন্নয়ন-কার্যে প্রবৃত্ত হন। পল্লীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন

রীতিনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং গ্রামবাসীর প্রকৃত অভাব-অভিযোগ কি—এই সকল বিষয় তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন না। ফলে সংস্কারকের যাবতীয় সদুপদেশ (sermon) শুনিয়া গেলেও গ্রামবাসীর মনে কোন রেখাপাত হয় না। গ্রামবাসী তাহার প্রাচীন আচার-ব্যবহারগুলিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

যাহা কিছু প্রাচীন তাহার সবই মন্দ ও বর্জনীয়, ইহা অত্যন্ত ভুল কথা। প্রাচীন আচার বা রীতিনীতি বর্জন করিবার সমর্থনে যত যুক্তিই থাকুক না কেন, একটি কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য। কালের নিকষে প্রাচীনের যে পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, নবীনের সেই পরীক্ষা এখনও হয় নাই। একটা সাময়িক উত্তেজনায় প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকে বরণ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু কালের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীন নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিবে কিনা, তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই। কাজেই প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকে গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রাচীনের দোষগুণ ভাল করিয়া বিচার করিবার প্রয়োজন আছে। উপদেশ দিবামাত্রই গ্রামবাসী সাগ্রহে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে—এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা যে উপায়ে গ্রামের উন্নতি করিতে চাই এবং যে যে বিষয়ের সংস্কারসাধন করিতে প্রয়াসী, তাহা সত্যসত্যই পল্লীজীবনের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের অনুকূল কিনা, তাহা বিচার করিতে হইবে। গ্রামের উন্নতি ও গ্রাম্যজীবনের সংস্কার-প্রয়াসী প্রত্যেক কর্মীকে যত্ন, নিষ্ঠা ও গভীর সহানুভূতির সহিত গ্রামবাসীর মনোভাব, তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। একটু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভিন্ন ইহা সম্ভব নহে। শত দুঃখ-দৈন্য, দোষত্রুটি সত্ত্বেও গ্রামবাসীর এমন কতকগুলি অতি চমৎকার সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে অতি সহজেই যে-কোন জনকল্যাণকর আন্দোলনের পথ সুগম ও সফল করিয়া তোলা যায়।

সহজাত উদারতা—গ্রামবাসীরা স্বভাবতঃই কিছুটা উদার

মনোভাবাপন্ন। দারিদ্র্য ও অনটনের পোড় খাইয়া উহারা পরের দুঃখ-দুর্দশার কথা যত সহজে বুঝিতে পারে, শৌখিন, আত্মকেন্দ্রিক শহরবাসীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। শহরের জনতা ও ব্যস্ততার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই বিব্রত,—প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার সময়টুকু পর্যন্ত নাই। কিন্তু গ্রামের জনবিরল শান্ত পরিবেশে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কম-বেশী সম্পর্কিত। একের সুখ-সম্পদ অথবা দুঃখ-দুর্দশার ভাগীদার অন্য দশজন। গ্রামে যখন বেকার-সমস্যা দেখা যায়, তখন অনেক ক্ষেত্রে শ্রমজীবীরা পালাক্রমে মজুর খাটে,—উদ্দেশ্য, সকলের ভাগেই কিছু কিছু জুটুক।

অতিথিপরায়ণতা—অতিথিসৎকারপ্রবৃত্তি গ্রামবাসীদের আর একটি বড় গুণ। শত অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রাম্য গৃহস্থ অতিথিকে বিমুখ করিতে চাহে না। ভারতবর্ষীয়েরা অতিথিসেবাকে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া মনে করে। আর্থিক জীবনের রূঢ় সংঘাতে শহরবাসীরা এই প্রাচীন প্রথাটিকে বর্জন করিয়া থাকিলেও, গ্রামবাসীরা এখনও ইহাকে নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা—

—"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,"...

ভারতের গ্রাম্য গৃহস্থ ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। এমন অল্পে সন্তুষ্ট, ভবিতব্যে বিশ্বাসী এবং বিদ্বেষ-অভিযোগ-বিহীন মানুষ জগতের যেকোন দেশে বিরল। গ্রাম্য কৃষক-সম্প্রদায়কে অনেকে অলস বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন,—কিন্তু ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, বৎসরের পর বৎসর বিনা প্রতিবাদে, বিনা অভিযোগে এই কৃষককুল কি অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কত প্রাকৃতিক দুর্যোগে

ও কত ভাগ্য-বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে নীরবে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া সমগ্র দেশের অন্নসংস্থান করিয়া যাইতেছে। পরাজয়ের পর পরাজয় ইহাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। অভাব, অর্ধাশন, অ-স্বাস্থ্য—সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া ইহারা দিনের পর দিন নূতন আশায়, নূতন উৎসাহে নিজ নিজ কাজ করিয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবেতনভোগী পণ্ডিত মহাশয় দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর পুরুষানুক্রমে শিক্ষার্থিগণকে অ-আ-ক-খ শিখাইয়া চলিয়াছেন। বিরাম নাই, অসন্তোষ নাই, অভিযোগ নাই! ধৈর্যের ইহা এক পরম পরাকাষ্ঠা—জাতীয় চরিত্রের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য!

একান্নবর্তিতা—শহরে আর্থিক জীবনের কৃচ্ছ্রতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন একান্নবর্তিতা-প্রথার দ্রুত বিলোপ ঘটিতে থাকিলেও গ্রাম্য জীবনে এখনও ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সময়োপযোগী পরিবর্তন ও সংস্কার দ্বারা এই বহু প্রাচীন প্রথাটিকে আবার নূতন করিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের ঐক্য ও দৃঢ়তা-বৃদ্ধিকল্পে কাজে লাগান যাইতে পারে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, একান্নবর্তিতা অনেকাংশেই আধুনিক লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিত। গ্রাম্য জীবনের উন্নতি ও পুনরুজ্জীবন করিতে হইলে এই প্রথাটির আমূল বিনাশসাধন না করিয়া কালোপযোগী সংস্কার করিয়া লওয়াই সমীচীন।

গ্রাম ও সমাজ-সেবাব্রতী কর্মী-মাত্রকেই গ্রামবাসীর মজ্জাগত দোষ-গুণগুলির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। নেতিমূলক উপদেশ-বাণী প্রচার করিয়া কোন সুফলই পাওয়া যাইবে না। প্রকৃত দরদ, আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত প্রত্যেকটি সমস্যা অনুধাবন করিয়া তাহার সমাধানে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক কাজেই গ্রামবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা চাই এবং পূর্ণ সহযোগিতা পাইতে হইলে গ্রামবাসীর মনের সন্ধান রাখিতে হইবে। এই জন্যই মনস্তত্ত্বের অনুশীলন আবশ্যক।

"ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।
ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ইংলণ্ডে জনশিক্ষার স্বরূপ

দার্শনিকপ্রবর জেমস মিল (James Mill) মনে করিতেন যে, দেশের সমস্ত নরনারী লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেই জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে; কারণ, আক্ষরিক জ্ঞান হইতেই মানসিক উৎকর্ষ ও মানসিক উৎকর্ষ হইতেই সদ্‌বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার বিকাশ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তানায়কগণের অনেকেই জেমস মিলের মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, সর্বজনীন আক্ষরিক জ্ঞান ব্যতীত সমাজ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। শিক্ষা-আন্দোলন বলিতে আক্ষরিক জ্ঞান বা literacy-র প্রসার বুঝাইত। দেশের প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারী যাহাতে অক্ষর-জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং দেশে যাহাতে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়,—অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যাবতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ইহাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে গিয়া বহু শিক্ষাব্রতী ও কর্মীকে অশেষ নির্যাতন ভোগ এবং দুঃখ বরণ করিতেও হইয়াছে। রক্ষণশীল, পুঁজিবাদী ও ধনী সম্প্রদায় কায়েমী স্বার্থহানির আশঙ্কায় তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া জনশিক্ষার শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পর আজ প্রগতিপন্থীরা জয়লাভ করিয়াছে। নেহাত শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাদ দিলে ইংলণ্ডের শতকরা শতজন ব্যক্তিই শিক্ষিত অথবা আক্ষরিক

জ্ঞান-সম্পন্ন। কিন্তু আপাত-উদ্দেশ্যের দিক দিয়া জনশিক্ষা-আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলেও আদর্শের দিক দিয়া ইহার অভীষ্ট লক্ষ্য এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। রয়্যাল সোসাইটির (Royal Society) তদানীন্তন সভাপতি মিঃ গিড্ডি (Giddy) ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জনশিক্ষা-আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, লিখিতে ও পড়িতে শিখাইলে দেশের শ্রমিক-সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহমূলক ও অ-খ্রীষ্টীয় কুগ্রন্থ ও কুসাহিত্য-পাঠে আসক্তি জন্মিবে। মিঃ গিড্ডির এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে না হইলেও অনেকাংশেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলির প্রচার-সংখ্যাই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রমিক-দলের মুখপত্র সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রচার-সংখ্যা দশ হইতে চল্লিশ লক্ষ। সুতরাং ইহাদের জনপ্রিয়তা অবিসংবাদী। শ্রমিক-দল ব্যতীত অন্যান্য দলের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির প্রচারও এইরূপ অধিক। ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাময়িক পত্রিকার মারফত পরবর্তী শিক্ষার প্রসার খুব ভালভাবেই চলিতেছে। কিন্তু এইসব প্রচার-বহুল পত্রিকার মারফত যে-জাতীয় সংবাদ লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা নিত্য আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেছে, তাহা রাজদ্রোহ-মূলক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এইসব সংবাদের বেশির ভাগই খুন-জখম, মেয়ে ফুসলান, বিবাহ-বিচ্ছেদ, জুয়াখেলা, যৌনব্যাধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, ও খেলাধুলা—এই-জাতীয় চাঞ্চল্যকর বিষয়-সংক্রান্ত। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, literacy বা অক্ষর-জ্ঞানের বহুল প্রসার সত্ত্বেও জনসাধারণের সু-শিক্ষার এখনও ঢের বাকি। কুশিক্ষা অশিক্ষা অপেক্ষাও সমাজের অধিকতর অনিষ্টকর। তাই সভ্য দেশমাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা অথবা আক্ষরিক শিক্ষার বহুল প্রসার সত্ত্বেও 'পরবর্তী শিক্ষার' ব্যাপক আয়োজন ও ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষার আদর্শ ও ধারা যাহাতে বিকৃত না হইয়া প্রকৃত সমাজকল্যাণের পরিপোষক হইতে পারে, তৎপ্রতি

বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। শিক্ষাবিদ্ সি. ই. এম. জোয়াড (C. E. M. Joad) বলেন:

"Citizens without education are from the political point of view not men but sheep, ready to flock into appropriate pen at the voice of the shepherd crying the latest political scare as the advertiser selling the latest popular stunt."

অর্থাৎ—রাজনীতিক্ষেত্রে অশিক্ষিত নাগরিকের অবস্থা অনেকটা মেষপালের ন্যায়।—পালকের আহ্বানে মেষপাল যেমন বিনা দ্বিধায় খোঁয়াড়ে প্রবেশ করে, অশিক্ষিত নাগরিকও তেমনি বিনাবিচারে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর ধাপ্পায় প্রবঞ্চিত হয়।

সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের ন্যায় সুসংহত ও উন্নতিশীল দেশেও জনসাধারণ রাজনৈতিক অপপ্রচাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 'Hang the Kaiser' ('কাইজারকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাও'), Zinovieff letter (জিনোভিয়েফেব পত্র) এবং 'স্পেনেব গৃহযুদ্ধে বৃটেনের বৈদেশিক নীতি' প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর দলীয় প্রোপাগাণ্ডায়। সুপরিকল্পিত জনশিক্ষার সাহায্যেই জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষকে এইরূপ বিভ্রান্তির হাত হইতে মুক্ত রাখা যায়।

দেখা উচিত যে, জনসাধারণকে কি শিক্ষা দিলে তাহাদের স্বাধীন সদসৎ-বিচারবুদ্ধি, এবং নাগরিকতাব কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত হইতে পারে। বয়স্ক-শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বহু মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বয়স্কেরা সকলেই সাংসারিক লোক,—সুতরাং তাহাদিগকে এমন কিছু শেখান উচিত, যাহাতে তাহারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে। অর্থাৎ, কৃষককে কৃষিবিদ্যা, ধীবরকে মৎস্যবিদ্যা ও তন্তুবায়কে বয়নবিদ্যা শেখানই উচিত। কৃষিবিদ্যা, মৎস্যবিদ্যা, বয়নবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারিগরি-

বিদ্যার অনুশীলন যে অনাবশ্যক, তাহা কেহই বলিবে না। কিন্তু জনশিক্ষা বা পরবর্তী শিক্ষায় কারিগরি-শিক্ষার প্রবর্তন না করিলেও ক্ষতি নাই—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় ডেনমার্কের পিপল্‌স্‌ হাই স্কুলগুলির প্রোগ্রামে বা কার্যকলাপে।

ডেনমার্কের পিপল্‌স্‌ হাই স্কুলগুলিতে হাতে-কলমের কাজ অথবা কারিগরি-শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া ইতিহাস, সাহিত্য ও অর্থনীতি প্রভৃতি তত্ত্বীয় (theoretical) বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। অথচ এইসব প্রতিষ্ঠানে আগত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শ্রমিক অথবা কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বীয় বিষয়াদি-আলোচনার দ্বারা যে কৃষ্টির শিক্ষা (cultural education) ইহাদিগকে দেওয়া হয়, তাহারই ফলে ডেনমার্কের কৃষিসম্পদ এবং দুগ্ধজাত আহার্য দ্রব্যাদির অসামান্য উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ঋষি অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলিয়াছেন : "A young man is not competent student of political science, because he has had no experience of the affairs of life."—অর্থাৎ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পাঠ নিরর্থক। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বীয় বিষয় পাঠ করিয়া সংসারাভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিরা যে-পরিমাণে উপকৃত হইবে, তরুণমতি অর্বাচীন বালক-বালিকা কদাচ ততটা উপকৃত হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র-পরিচালনায় স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে সি. ই. এম. জোয়াড (C. E. M. Joad) বলিয়াছেন :

"The classes have no vocational value ; they will not bring promotion or higher pay, at the best they will polish a man's wits and improve his powers of discussion and argument. But the motive that animates most of the students is not utilitarian, it is educational in the purest sense."

অর্থাৎ বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কারিগরি-শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে যে বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীর (শ্রমিক এবং কারিগর-শ্রেণীর) আয় বাড়াইবার কোন কথাই থাকে না। শিক্ষার্থিগণ নিছক জ্ঞানবৃদ্ধির মানসেই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করে।

বর্ণনা-প্রসঙ্গে জোয়াড আরও বলিতেছেন, স্কুলগৃহের একটি অপেক্ষাকৃত অপরিসর, স্বল্পালোকিত এবং শীতল প্রকোষ্ঠে ছোটছেলেদের জন্য নির্মিত নীচু নীচু বেঞ্চে (বসিবার অসুবিধা সত্ত্বেও) যথেষ্টসংখ্যক বয়স্ক শিক্ষার্থী বসিয়া আছে। ইহাদের বেশির ভাগ হয় আফিসের কেরানি, কিংবা খনির শ্রমিক। ঘরটিতে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র, প্রাচীরপত্র বা সৌষ্ঠবময় সজ্জার বালাই নাই। কখনও হয়তো স্কুলগৃহের বদলে স্থানীয় গীর্জাঘরের মেঝেয় বা কোন ট্রেড্ইউনিয়ন-আফিসে বয়স্ক-শিক্ষার ক্লাস বসে। বয়স্কেরা প্রায়ই যথাসময়ে হাজিরা দেয়; কাহারও কাহারও বা একটু দেরি হইয়া যায়। ইহারা সকলেই সারাদিন ৮।৯ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার অবসরটুকুতেই শিক্ষাকেন্দ্রে আসিবার সুযোগ পায়। আফিস, মিল, ফ্যাক্টরি বা খনির কাজ সারিয়া কর্মী ও শ্রমিকদের অনেকেই সরাসরি শিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, অনেকে আবার বেশ পরিবর্তন করিয়া এবং সান্ধ্য আহার সারিয়া লইবার জন্য একবার গৃহে যায়। কিন্তু বেশির ভাগের পরিধানেই আফিস বা ফ্যাক্টরির পোশাক। এত অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও বয়স্কদের শিখিবার প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'বয়স্ক-শিক্ষার' কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় জায়গায় জায়গায় কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বয়স্কেরা অনেকটা নিজেদের গরজেই এইসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে যোগদান করিয়া বাল্য-জীবনের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ডের জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই অনাবাসিক (non-residential), কয়েকটি

মাত্র আবাসিক (residential)। আবাসিক প্রতিষ্ঠান কয়টির মধ্যে ইম্পিংটন কলেজটির (Impington College) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কলেজ-গৃহটির স্থাপত্য ও গঠননৈপুণ্য অত্যন্ত সুদৃশ্য। গৃহটির মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ হলঘর এবং দুইপার্শ্বে দুইটি দীর্ঘবাহু (wing) প্রসারিত। ইহারই একটি বাহু স্থায়ী বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে ব্যবহৃত হয়। আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত। স্নান, আহার, বিশ্রাম, পড়াশুনা, আলোচনা-বৈঠক, খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ সব-কিছুরই অতি নিখুঁত ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিক্ষা, শিক্ষণ, বক্তৃতা, আলোচনা, নৃত্যগীত, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি নানা বিচিত্র কর্মানুষ্ঠানে কেন্দ্রটি সর্বদাই কলমুখর। প্রকোষ্ঠগুলির সাজসজ্জা খুব সাদাসিধা, অথচ সুন্দব ও সুরুচির পরিচায়ক।

ইম্পিংটনের লোকসংখ্যা ৭,৫০০। ১৯৭২ সনে চৌদ্দ হইতে সত্তব বৎসর বয়স্ক প্রায় তের শত লোক এই কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছিল। গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০০জন বয়স্ক ব্যক্তি এই কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ইহা হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যে-অনুপ্রেরণার বশবর্তী হইয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ 'পরবর্তী শিক্ষার' প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত, বাহির হইতে কোন প্রভাব তাহাদের উপর প্রয়োগ করা হয় নাই। স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন বলেন যে, যেমন একটি মোটরগাড়ী ক্রয় করিয়া ঘষা-মাজা না করিলে উহা অচল হইয়া পড়ে, তেমনি রীতিমতো চর্চা না রাখিলে আমাদের বাল্যে বা বিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষাও অকেজো হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই 'পরবর্তী শিক্ষা'র এত অধিক প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সমগ্র জাতির মানসিক সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আর কোন উপায় নাই।

চীন-জাপানে জনশিক্ষা

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষ ও চীন—এই উভয় দেশের অবস্থা প্রায় একরূপ। সভ্যতার প্রাচীনত্বে এই দুই দেশই জগতের আদিস্থানীয়, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে সেই গৌরবময় ইতিহাস আজ অতীতের স্মৃতিমাত্র। কিন্তু বহু শতাব্দীর মোহতন্দ্রা-অবসানে এই দুই জাতি নূতন প্রাণ-স্পন্দনে চঞ্চল ও নবজাগরণের ইঙ্গিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। আয়তনের বিশালত্ব ও জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি বিষয়েও এই দুই দেশ পরস্পরের অনুরূপ। ভারত ও চীন উভয়েই কৃষিপ্রধান দেশ—জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগেরও বেশি গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে যান্ত্রিক সভ্যতার সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও সমগ্র দেশের অতি অল্প অংশেই ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনে ও ভারতে দেশ বলিতে এখনও গ্রাম ও গ্রামবাসীকেই বুঝায়। শহর-অঞ্চলে শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার হইয়া থাকিলেও উভয় দেশেরই লক্ষ লক্ষ গ্রাম অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। যেমন ভারতে তেমনই চীনে শিক্ষা-প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আজ জাতির প্রধান সমস্যা-রূপে দেখা দিয়াছে। কাজেই জনশিক্ষা-প্রসারের যে-চেষ্টা চীনদেশে চলিয়াছে বা চলিতেছে এবং যে-উপায়ে চীনবাসীরা এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে চেষ্টিত হইয়াছে, তাহা ভারতের জনশিক্ষা-সমস্যার উপর প্রচুর আলোকপাত করিবে।

নবজাগ্রত চীনের শিক্ষা-আন্দোলনের পটভূমিকা হিসাবে প্রাচীন ইতিহাসের সামান্য কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দল বা কুয়োমিন্‌টাং (Kuomintang) দলের নেতৃত্বে যে-রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহারই ফলে প্রাচীন মাঞ্চু-রাজবংশের পতন ঘটে এবং ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের (Dr. Sun Yat Sen) নেতৃত্বে চীন সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে

দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্তনকল্পে যে-নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। কিন্তু প্রাগ্‌বিপ্লবকালের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও একটু জানা দরকার।

মাঞ্চু-রাজবংশের শাসনাধীনে দেশের অবস্থা আশ্চর্যজনকভাবে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় অবস্থার সহিত উপমেয়। দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রামবাসীরা ছিল স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং তাহাদের জীবনযাত্রার যাবতীয় চাহিদা গ্রামের মধ্যেই মিটিয়া যাইত। লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার কল্পনাই করিত না। বহু গ্রামেই প্রাচীন ধরনের পাঠশালা বা বিদ্যালয় ছিল। এইসব বিদ্যালয়ে কন্‌ফুসিয়াস (Confucious) এবং লাওৎসে (Laotse) প্রমুখ প্রাচীন ঋষিগণের বাণী ও উপদেশাবলীই ছিল একমাত্র পাঠ্য বিষয়। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া যে-কোন বালকই শহরের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিত। শহরের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য ছিল ঐ একই বিষয় এবং পাঠ-সমাপনে যে-শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহাতেও প্রাচীন ঋষিগণের উক্তি ও উপদেশই ছিল একমাত্র বিষয়বস্তু। পরীক্ষার্থিগণকে পরীক্ষার পূর্বে একটি ছোট কুঠুরিতে কয়েকদিন বা সপ্তাহের জন্য একাদিক্রমে আটকাইয়া রাখা হইত। এই কুঠুরিতে একটিমাত্র ছোট গবাক্ষ থাকিত, যাহার ভিতর দিয়া পরীক্ষার্থীর আহার্য ও পানীয় সরবরাহ করা হইত। এইভাবে আবদ্ধ থাকিয়া পরীক্ষার্থীকে দশ বা পনের বৎসরের অধীত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইত। এই অদ্ভুত পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইত, তাহারাই মাঞ্চু-রাজসরকারে শাসক বা অন্য সরকারী কর্মচারী-রূপে নিযুক্ত হইত। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করিয়া রাজকর্মচারীরা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। দেশে শান্তিসংরক্ষণ এবং বন্যাপ্রতিরোধকারী বাঁধসমূহের (dykes) তত্ত্বাবধান করাই ছিল শাসক-সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য। গ্রামবাসীরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (Home-rule) উপভোগ

করিত। গ্রাম্য কৃষককুল বহির্বাণিজ্য ও বহির্ভ্রমণ ইত্যাদির ধার ধারিত না। ফসল ভাল হইলেই লোকের সুখ ও শান্তি অব্যাহত থাকিত। একমাত্র দুর্ভিক্ষ ও গৃহযুদ্ধ ব্যতীত চীনবাসীদের কোন অশান্তি বা অসন্তোষ ঘটিবার কারণ ছিল না। দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ অথবা কোন নৈসর্গিক বিপর্যয় উপস্থিত হইলে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

দেশের এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক বিপ্লবের ফলে। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ও তাঁহার জাতীয় দল উপলব্ধি কবেন যে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে এবং দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার অপরিহার্য। জাতীয় সরকারের চেষ্টাতেই গ্রামে গ্রামে নূতন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত এবং পাঠ্য বিষয়ের আমূল সংস্কার সাধিত হইল। এই সঙ্গে বিদেশী মিশনারীগণেব অবদানও উল্লেখযোগ্য। এখন জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষার তাগিদ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান চীনের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, মেয়েরাও শিক্ষালাভে সমান আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। চীনের আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই co-educational এবং শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা পরিচালিত। চীনের পল্লীসমাজে পর্দাপ্রথা না থাকায় ভারত অপেক্ষা চীনে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সহজতর।

চীনের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এবং তৎস্থলে এক নূতন সমাজ ও রাশিয়ার সাম্যবাদ হইতে স্বতন্ত্র, জাতীয় ভাবের প্রাধান্য-বিশিষ্ট এক নূতন ধরনের সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন জাতির অভ্যুদয় ঘটিতেছে। জাতির এই নব যাত্রাপথের অত্যাবশ্যক পাথেয় হিসাবে প্রত্যেক নরনারীকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সুযোগ্য নাগরিকরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র-পরিচালকগণের। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া

জাতীয় জীবনের মান (National standard of living) উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণের আনুগত্য ও কর্তব্যবোধ জাগরিত করিয়া তোলা,—সংক্ষেপে ইহাই চীনের জনশিক্ষা-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত চীনের সর্বত্র এক ব্যাপক জনশিক্ষা-আন্দোলন পরিচালিত হইতে দেখা যায়। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে দেশের শান্তিময় পরিবেশে জনশিক্ষা দ্রুততর গতিতে প্রসার লাভ করিতেছে

চীন সরকার ও জনসাধারণ কি উপায়ে এই দেশব্যাপী বয়স্কশিক্ষা-আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত আভাস এখানে প্রদত্ত হইল :

দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত চীনা তরুণ-তরুণীর-দল প্রথমে কতকগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নিরক্ষর কৃষক নরনারীর মধ্যে কাজ আরম্ভ কবে। লেখা ও পড়া শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনেব কৃষিকার্য-প্রণালী, পশুপক্ষী-পালন, সমবায়-নীতি, স্বাস্থ্য-বিধি ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইল। চীনের বহুস্থানে এইরূপ জনশিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইল। এই সকল কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) কিয়াংসি প্রদেশের অন্তর্গত উসী নামক স্থানে অবস্থিত জনশিক্ষা কলেজ (College of Mass Education at Wusih in Kingsi).

(২) শান্‌টুং প্রদেশের অন্তর্গত ইসিওপিং নামক স্থানে অবস্থিত বয়স্ক-শিক্ষাপীঠ (Institute of Adult Education at Iseo-ping in Shantung).

এই প্রতিষ্ঠান দুইটিই সরকারী খরচে এবং কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহা ছাড়াও বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে হোপি (Hopei) প্রদেশের অন্তর্গত টিং সীন (Ting Hsien) নামক স্থানে অবস্থিত ডাঃ জেমস্‌ ইয়েনের (Dr.

James Yen) প্রতিষ্ঠানটি। ডাঃ জেমস্ ইয়েন্ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের এক চীনা শ্রমিকদলের (Labour corps) নায়ক রূপে কাজ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অধীনস্থ শ্রমিকেরা প্রায় সকলেই অক্ষরজ্ঞানহীন,—দেশে নিজেদের বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখিবার প্রয়োজনেও ইহারা পরমুখাপেক্ষী। যুদ্ধাবসানে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ডাঃ ইয়েন্ শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯২৫ সনে টিং সীন বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রটি ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া একটি বিরাট্ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে এখানে প্রায় দুইশতজন কর্মী অতি সামান্য পারিশ্রমিকে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ ও সামাজিক শিক্ষা-প্রসারের কাজে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের কার্যসূচী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ অর্থাৎ লিখিতে ও পড়িতে শেখান। যে-বিশিষ্ট উপায়ে ডাঃ ইয়েন্ ও তাঁহার সহকর্মিগণ তিন বৎসরের মধ্যে টিং সীন্ জেলার প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারীকে আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

চীনাদের ভাষা বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্যে লিখিত হয় না। বর্ণ বা অক্ষরের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি ছবি একটি শব্দবাচক। প্রত্যেকটি শব্দের জন্য এক-একটি পৃথক ছবি নির্দিষ্ট আছে। চীনাভাষায় লিখিত যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন ১,০০,০০০টি ছবি বা শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হয়। সুতরাং সমস্যাটি যে কতদূর জটিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ ইয়েন্ প্রথমে এই জটিল সমস্যার একটি সহজ সমাধান বাহির করিলেন। কথাবার্তায় ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত ১০০০টি শব্দ বা চিত্র বাছিয়া লইলেন এবং সেই নির্বাচিত শব্দসমষ্টির সাহায্যেই তাঁহার অভিযান সুরু করিলেন। টিং সীন্ জেলার মোট জনসংখ্যা ৪,০০,০০০ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫০০ শত। মোট জনসংখ্যার মধ্যে

১৩ হইতে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৮০,০০০। ডাঃ ইয়েন্ প্রথমে এই ৮০ হাজার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার লইলেন এবং মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের প্রত্যেককে সাক্ষর করিয়া তুলিলেন। তিনি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, চারমাসে মোট ৯৬ ঘণ্টা অর্থাৎ গড়ে দৈনিক একঘণ্টারও কম সময়ে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করিয়া তোলা সম্ভব। অক্ষর-জ্ঞান জন্মিবার পর যাহাতে পরবর্তী শিক্ষার কাজ সুষ্ঠু ও সহজভাবে অগ্রসর হইতে পারে, সেইজন্য আরও দুই হাজাব বা তিন হাজার প্রচলিত শব্দ চয়ন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে বয়স্কদের উপযোগী পুস্তকসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া তোলা হয়। গ্রামবাসীরা যাহাতে অবাধে এইসব পাঠাগারের সুবিধা ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে।

কার্যসূচীর দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ আক্ষরিক জ্ঞান হইবার পর জনসাধারণের সামাজিক শিক্ষার জন্য যে-কয়েকটি বিষয়ের অনুশীলন করা হয়, তাহা এই ঃ

(১) আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন।
(২) স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা।
(৩) সামাজিক শিক্ষা।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দের সহযোগিতায় সরকারী কর্মচারীদিগকেও বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত কার্যসূচী সফল করিয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। সমগ্রভাবে এই জনশিক্ষা-প্রচেষ্টাকেই চীনের 'নূতন জীবন-আন্দোলন' বা 'New Life Movement' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় প্রাচ্যভূখণ্ডের যাবতীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপান অগ্রণী। জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন নরনারী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। জাপানের নিভৃততম পল্লীতেও একটি

প্রাথমিক বিদ্যালয় অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি কাঠামো এইরূপ :

৫-৭ বৎসর—কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুবিদ্যালয় (বাধ্যতামূলক নহে)

৭-১২ বৎসর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়

মধ্য বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয়। বাণিজ্য বিদ্যালয়। শিল্প বিদ্যালয়। কৃষি-বিদ্যালয়।
এইসব বিদ্যালয়ই সরকারী, কিন্তু ইহাতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক নহে।]

উচ্চ সাহিত্য বিদ্যালয় উচ্চ বিজ্ঞান বিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য। আইন। বিজ্ঞান। বাণিজ্য। কৃষি। চিকিৎসা। ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

জাপানী শিক্ষানীতির মূলকথা—জাপানীদের জাতীয়তা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সম্বন্ধে গৌরববোধ, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করা।

সাত হইতে বার বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাধ্যতামূলক প্রথার প্রবর্তন হয় নাই। সুতরাং শতকরা ৯৫ জন নরনারী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও জাপানে জনশিক্ষা বা বয়স্ক-শিক্ষার প্রভূত প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরেই নৈশবিদ্যালয় আছে। এই সকল নৈশবিদ্যালয়-পরিচালনার ভার 'বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে। ইহারাই জাপানে বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। জাপানের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় ও বণিক-সভাগুলি (Chamber of Commerce) বয়স্কদের সুবিধার জন্য নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করে। জাপানের নৈশবিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক (vocational) শিক্ষার ব্যবস্থাই করা হয়,

কারণ আপামর জনসাধারণ সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। গ্রামাঞ্চলের নৈশবিদ্যালয়গুলিতে কৃষিকর্ম বা তৎজাতীয় বিষয় এবং শহরের নৈশবিদ্যালয়সমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বীজগণিত, ইংরাজী, টাইপরাইটিং, স্থাপত্যবিদ্যা, প্রভৃতির চর্চা ও আলোচনা হইয়া থাকে।

শহরের শিক্ষাসঙ্কট

বিখ্যাত ব্যঙ্গ-পত্রিকা 'পাঞ্চ'এ একবার একটা কৌতুকপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছিল:

Wanted a flat in Paris in exchange of a job in New York.

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অগণিত শরণার্থীর ভিড়ে প্যারী নগরীতে অভাব ঘটিয়াছিল আবাসগৃহের বা ফ্ল্যাটের, আর যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার দরুন নিউ ইয়র্কে চাকুরির বাজার ছিল বেজায় মন্দা। প্যারীতে ফ্ল্যাট পাওয়া ছিল যেমন দুষ্কর, নিউ ইয়র্কে একটা চাকুরি যোগাড় করাও তেমনি ছিল দুর্ঘট।

প্রতি বৎসর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কলিকাতার হাই স্কুলগুলিতে যে-ছাত্রভর্তির ভিড় লাগে, আর একটা মনোমত ভাল স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা হয়ে দাঁড়ায় যেমন দুর্ঘট, তাতে 'পাঞ্চ-এর' ঐ ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তির কথাটাই স্মরণ হয়। মনে হয় চাকুরির এই মন্দা বাজারে যদিচ একটা চাকুরি যোগাড় হয়, কিন্তু কোন একটা ঈপ্সিত স্কুলে ছাত্র ভর্তি নৈব নৈব চ। অনেকগুলি স্কুলের কথাই জানি। সর্বনিম্ন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট ত্রিশটি স্থানের জন্য তিন-চার শত আবেদনপত্র দাখিল হয়। একটা নির্বাচনী পরীক্ষা বা admission test হয়। এই টেস্টে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় তাহা হয় বহুক্ষেত্রেই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মান অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। তাহা ছাড়া উপায়ই বা কী? যেখানে এক-দশমাংশকে বাছিয়া লইতে হইবে—সেখানে এই কৃত্রিম

কঠোরতা অবলম্বন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উপর আবার রহিয়াছে সুপারিশের ঠেলা।

প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বহু ব্যক্তির সুপারিশপত্র, উপরোধ-অনুরোধ আসিবে পরিচালকমণ্ডলী বা প্রধান শিক্ষকের কাছে। ছাত্র-ভর্তি লইয়া স্কুল কর্তৃপক্ষকে বড় কম ঝামেলা পোহাইতে হয় না। আর বেচারা অভিভাবকের শোচনীয় অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়! দেখা যায় যে, যার সুপারিশের জোর কম, তেমন অভিভাবকের এ-স্কুল হইতে ও-স্কুল, আবার সেখান হইতে অন্য কোথাও দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাঘুরির অন্ত নাই। প্রখ্যাত, অল্পখ্যাত বা অখ্যাত যে কোন স্কুলেই নিদারুন ভিড়। যে ভাগ্যবান কয়টির ভাগ্যে ভর্তির শিকা কোনও মতে বা ছিঁড়িল, তাহারা সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। বহুসংখ্যক ছেলেমেয়েকেই স্কুল-ছাড়া হইয়া থাকিতে হইল। স্কুলগুলির অবস্থাও অবর্ণনীয়। গোটাকয়েক মিশনারী আর সরকারী স্কুল ছাড়া, কলিকাতার বেশির ভাগ্ স্কুলই ভাড়াটে বাড়ীতে বসে। প্রকোষ্ঠগুলি অন্ধকার ও অপরিসর, খেলাধূলার জন্য মাঠ বা খোলা জায়গায় কোন বালাই নাই, তত্ত্বাবধান বা supervision-এর পক্ষে নিতান্তই অসুবিধাজনক, স্কুলগৃহের চারিপাশের আবহাওয়া বা পরিবেশ আদৌ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল নয়। মোটামুটি এই হইল কলিকাতার অধিকাংশ স্কুলের অবস্থা। সেই কোন কালে কোন এক বদান্য ব্যক্তি হয়তো কোন স্কুল-বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন, তারপর কতো ওলট-পালটই না ঘটিয়া গেল। এল যুদ্ধ, এল কালোবাজার—এক শ্রেণীর লোকের হাতে আসিল লাখো লাখো, কোটি কোটি টাকা। কলিকাতায় কতো বড়ো বড়ো, তাক-লাগানো, চোখ-ধাঁধানো, আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীই না তৈয়ারি হইতেছে। কিন্তু এসবই হয় সিনেমা-হল, নয় ব্যবসায় বা সওদাগরী আফিস, নয় অতি দুর্মূল্য ফ্ল্যাট-বাড়ী। কিন্তু একটাও স্কুল-বাড়ী হইতে দেখা যায় না। স্কুল-কলেজের জন্য বাড়ী-ভাড়া পাওয়াও দুষ্কর,—তাহার কারণ যে-পরিমাণ ভাড়া ও সেলামি বাড়ীওয়ালারা দাবি করিয়া

বসে তা দিতে গেলে স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি বিলাতী কেতায় দু' একটা নূতন স্কুল কলিকাতায় খুলিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা কলিকাতার স্কুল-সমস্যার তুলনায় সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর মতো। মোট কথা কালোবাজারী বড়লোকেরা মুনাফা-বিহীন স্কুল-কলেজ ইত্যাদির জন্য পয়সা খরচ করিতে একান্তই নারাজ। বহু সমস্যা-সঙ্কুল বর্তমান কলিকাতার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থানাভাব বা লোকাধিক্যও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা স্কুল-কলেজের শিক্ষাল্পতা বা ছাত্রসংখ্যার অত্যধিক চাপ,—এ অবশ্য আজকালের কলিকাতার বহু বিড়ম্বিত নাগরিক জীবনেরই একটা আংশিক প্রতিচ্ছবি।

এই মহানগরী কলিকাতা! একদা কথিত Second City of the British Empire over which the Sun never sets, নব্য বঙ্গ, তথা নব্য ভারতের প্রাণকেন্দ্র। এরই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন বাঙালী কবি ঃ

> গৌড় আজিকে গৌরবহারা, যশোহরে নাই
> যশের আলো,
> অল্পবয়সী এই কলিকাতা প্রবীনেরা এরে
> বাসে না ভালো।
> বিদেশী ইহারে করেছে লালন, স্বদেশের যতো
> ইহাবে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু, এরই নয়নের
> কিরণ পিয়া।

নব্য বঙ্গের নবীনা নগরী এই কলিকাতা আমাদের আদরের জিনিস,—ইহাকে লইয়া আমাদের গর্বের অবধি নেই। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে, জাতির যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইতেছে। এই মহানগরই সারা দেশের হৃদয়যন্ত্র-স্বরূপ। রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কলিকাতার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। দেশ শাসিত হইতেছে কলিকাতার নির্দেশে। একদিকে ধর্ম, রাজনীতি,

শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি আবার অন্যদিকে হুজুক হাঙ্গাম সব কিছুরই উৎস এই মহানগরী।

রাজ্যমাত্রেরই রাজধানী আছে, কিন্তু যে অর্থে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ঠিক সেই অর্থে বোম্বাই বোম্বাই রাজ্যের, মাদ্রাজ মাদ্রাজ রাজ্যের বা লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী নহে। দেশ-বিভাগ-জনিত সঙ্কুচিত ও জনবহুল পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন নিজ অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে এদিক দিয়া একটি City State বা নগর-রাষ্ট্র রূপেও অভিহিত করা যায়।

কলিকাতার সঙ্কটময় শিক্ষা-সমস্যাগুলি বর্তমান কলিকাতার সাধারণ শোচনীয় অবস্থারই প্রতিফলক। বিগত মহাযুদ্ধ, তেতাল্লিশ সনের মন্বন্তর এবং সর্বোপরি দেশবিভাগ—পরপর এই তিনটি সাংঘাতিক ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাতে বাঙালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবন আজ বিধ্বস্তপ্রায়। আবার বাংলার রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতাকেই এই আঘাতের প্রচণ্ডতা সর্বাপেক্ষা বেশী সহ্য করিতে হইতেছে। সেকালের কলিকাতায় নানা দেশ হইতে মানুষ আসিত ব্যবসা করিতে আর বড়লোক হইতে।

"ধন্য হে কলকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হ'ল যে কাঙাল॥
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলকাতা গিয়ে বাস করে॥"

এই পুরাতন কথাগুলো বহুলাংশে আজকের দিনের কলিকাতা সম্বন্ধেও খাটে। বড়লোক হইবার জন্যই সারা মুলুকের মানুষ এখানে আসিয়া ভিড় জমায়। আসে ভাগ্যান্বেষীর দল, আসে বেকার, আসে দলে দলে ছিন্নমূল পাকিস্তান-বিতাড়িত নরনারী। শেষোক্ত আগন্তুক

দলের আসার যেন বিরাম নাই। স্বাধীনতা যজ্ঞের তারাই বৃহত্তম বলি। দেশ-বিভাগ রূপ প্রচণ্ড আলোড়নে উত্থিত হলাহল সবটাই আজ গলাধঃকরণ করিতে হইতেছে কলিকাতাকে।

সাধারণ ও স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে কলিকাতায় বসবাস করা আজ কিরকমের ঝকমারি, তাহার আভাস পাওয়া যায় ১৯৫১ সনে সেন্সাস রিপোর্টে। সেন্সাস রিপোর্টের কতকগুলি তথ্য হইতে কলিকাতার প্রকৃত অবস্থাটা প্রকট হইয়া উঠে।

১৯৫১ সনের ১লা মার্চ তারিখে শহর কলিকাতার মোট আয়তন ছিল ৩২ বর্গমাইল আর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫,৪৮,৬৭৭। এর বিশ বছর পূর্বে ১৯৩১ সনে কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১১,৬৩,৭৭১, আয়তন প্রায় একই ছিল। কাজেই দেখা যায় যে বিশ বৎসরে শহরের লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে, অথচ আয়তন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। আধুনিক শহরগুলির মতো কলিকাতা আকাশমুখী (skyward) বিস্তৃতিও বিশেষ লাভ করে নাই। অতি সম্প্রতি দু'চার পাঁচটা আকাশ-ছোঁয়া (sky-scrapper) ইমারত তৈয়ারী হইলেও সেগুলি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মাথা গুজবার ঠাঁই রূপে ব্যবহারের জন্য নয়। সেগুলি প্রায় সবই সওদাগরী বা সরকারী আফিস। আজকাল কলিকাতায় জনতার চাপ কি পরিমাণ বাড়িয়াছে সেন্সাস রিপোর্ট তাহারও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে। ভারতবর্ষের শহরের চাইতে, এমন কি পৃথিবীর যে কোন শহরের তুলনায় কলিকাতায় জনতার চাপ অধিকতর। কলিকাতা শহরের প্রতি বর্গমাইলে ৮৯৯৩২ জন লোকের বাস, সে তুলনায় ভারতের দ্বিতীয় শহর বোম্বাইয়ে মাত্র ১৩৪৬৯ জন, আর রাজধানী দিল্লীতে ৩০,১৩৯ জন। কলিকাতার প্রতি একর জমিতে ৩৫০ জন লোক বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, আর সে তুলনায় বোম্বাইয়ে মাত্র ২১ জন এবং দিল্লীতে কেবল ৪৭ জন।

১৯৫১ সনের সেন্সাসে দেখা যায় যে, কলিকাতা শহরে মোট

বাড়ীর সংখ্যা ৬,০৬,০২৬ আর বাস-কক্ষের (living room) সংখ্যা ৭,১০,৫৭৯। প্রতি বাসগৃহে গড়ে ৩৬ জন লোক বাস করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, এক-একটি কামরায় ১০ জন অবধি লোক গাদাগাদি হইয়া বাস করে। অনৈতিহাসিক 'অন্ধকূপ'এর অতি বাস্তব ও মর্মান্তিক পুনরভিনয়! মধ্য ও স্বল্পবিত্ত লোকের সংখ্যাই বেশী, মোট জনসংখ্যার প্রায় নয়-দশমাংশই তাহারা, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই কলিকাতা শহরে তাহারা যে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে, তাহা মানুষের পক্ষে কেন, পশুর পক্ষেও অসহনীয়। কলিকাতার বস্তিগুলি যেন সারা শহরের গায়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে দুর্গন্ধ পচা ঘায়ের মতো। এখান হইতে যে বিষ সংক্রামিত হইতেছে, তাহাতে সারা শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মোট বস্তির সংখ্যা ৩,৬১৫; খোলার ঘরের সংখ্যা ২১,৫৫৬; আর অধিবাসীর সংখ্যা ৬১,১৭,৩৭৪। কলিকাতার মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বস্তিবাসী। আলোবাতাসহীন, নোংরামি ও কদর্যতার আকর এই বস্তিগুলির অবস্থা ভাষায় অবর্ণনীয়। এই বস্তিগুলির অধিকাংশই মলমূত্রাগার-বিহীন। ঠিক পশুর মতোই মানুষ স্থান-নির্বিশেষে যত্রতত্র মলমূত্রাদি ত্যাগ করে। কলিকাতার রাজপথ, ফুটপাথ, অলিগলি, পার্ক—সর্বত্রই আবর্জনা, জঞ্জাল ও নোংরামি। একদিকে নোংরামি আর একদিকে হৈ-চৈ। কোথাও একটু নিরিবিলিতে দুইদণ্ড বসিবার সুবিধা নাই। এ যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন অহেতুক উদ্দাম ধারায় মানুষের নিরুদ্দেশের যাত্রা! ইটের উপরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট! নিষ্করুণ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে মানুষত্ব আজ হৃদয়হীন পশুত্বে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া যেন এক অনির্বাণ আগ্নেয়গিরি, যে-কোন মুহূর্তেই একটা দিগ্বিদারী বিস্ফোরণের আশঙ্কা। ইহার একটা বড় কারণ কলিকাতার জনসংখ্যায় পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যার অল্পতা। হাজার পুরুষে মাত্র ৫৭০ জন স্ত্রীলোক। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন

সস্ত্রীক পারিবারিক জীবন-যাপনের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। সুস্থ সামাজিক জীবন গঠনের পক্ষে বিবাহিত পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষ অনুকূল। বিবাহিত জীবন মানুষকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও ধীরবুদ্ধি হইতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

কলিকাতা, আর কেবল কলিকাতাই নয়, প্রায় সব বড় বড় শহরেই দেখা যায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাবেশ। এক দিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ, অন্যদিকে ঘোর অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা; একদিকে সমৃদ্ধি ও সম্পদ, অন্যদিকে চরম দুঃখ-দৈন্য; একদিকে আরাম-আয়েশভোগী অভিজাত সম্প্রদায়, অন্যদিকে বঞ্চিত অভাজনের দল; একদিকে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা ও সৌন্দর্য, অন্যদিকে নোংরামি ও কদর্যতা; একদিকে পরিপূর্ণ ভোগ, আর অন্যদিকে অপরিসীম দুর্ভোগ—এই বৈষম্য ও বৈপরীত্য লইয়াই আধুনিক শহর। কলিকাতা জগতের বৃহত্তম নগরীসমূহের অন্যতম। কলিকাতার মতো এতো নোংরা শহর জগতে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ, ভারতের প্রথম শ্রেণীর শহরগুলির মধ্যে এবিষয়ে কলিকাতা নিকৃষ্টতম।

কলিকাতা একটি পুরোপুরি অপরিকল্পিত শহর, unplanned town। কলিকাতার সৃষ্টি হইয়াছিল নেহাতই আকস্মিকভাবে। ইহার আড়াইশত বৎসরের ইতিহাসে সেই আকস্মিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। ইংরাজ কবি রাডিওয়ার্ড কিপ্‌লিং-এর কথা কয়টি স্মরণ করা যাক:

"Thus from the midday halt of Charnock grew a city.
As the fungus sprouts chaotic from its bed,
So it spread.
Chance-directed, chance-erected, laid and built.
On the silt,
Palace, byre novel, poverty and pride
Side by side." —*Kipling*.

Problem-city Calcutta,—সমস্যাকণ্টকিত কলিকাতার নানা সমস্যার সঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে এখানকার শিক্ষা-সমস্যা। অন্য সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে শিক্ষা-সঙ্কটেরও অবসান হইবে না। আজকাল dispersal বা ছড়াইয়া দেওয়ার ধূয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনতিদূরে satlelite towns বা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট শহর-রচনার প্রয়াস চলিয়াছে, অনেকগুলি dispersal college অর্থাৎ মফঃস্বলে অধ্যয়নের জন্য কলেজও স্থাপিত হইয়াছে, কালে আরও হইবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কলিকাতার উপর জনতার চাপ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরঞ্চ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার এক কারণ পাকিস্তান, আর এক কারণ গ্রাম ছাড়িয়া শহরাভিমুখে জনতার গড্ডলিকা-প্রবাহ। প্রথম কারণ নিছক রাজনৈতিক। ইহার আলোচনা এখানে অবান্তর। দ্বিতীয় কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক প্রশ্নের একটা বড় উত্তর বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের বুনিয়াদ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। শিল্প-শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রশাসন-ব্যবস্থা—সব কিছুই কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া সারা দেশময় বিকেন্দ্রিত করিয়া দেওয়া দরকার। তাহাতেই রক্ষা পাইবে কলিকাতা, রক্ষা পাইবে সারা দেশ।

নাটক ও লোকশিক্ষা

বেশভূষা, চালচলন, কথাবার্তা—সব কিছুতেই খানিকটা অদ্ভুত, বেয়াড়া ধরনের এক খেয়ালী যুবক সদ্য লণ্ডনে আসিয়াছে। সে আসিয়াছে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে, আসিয়াছে ভাগ্যান্বেষণে। লণ্ডন বড় জায়গা,—সেই বিরাট জনসমুদ্রে এই নামগোত্রহীন নিঃসহায় নিঃসম্বল যুবকের স্থান কোথায়! সেই বিরাট ও বিচিত্র জনারণ্যের গহনে অমন কতো হাজার হাজার ভাগ্যান্বেষী কোথায় অজ্ঞাত অখ্যাত পড়িয়া রহিয়াছে—

কে তাহার হিসাব রাখে! এমন একটা বিষম সঙ্কটময় অবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে বিহ্বল বিভ্রান্ত হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই যুবকটির কথা আলাদা। অন্য দশ জন হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লোক সে। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অকাট্য যুক্তি-কৌশল ও সর্বোপরি অনুকরণশীল বাচন-পটুতা এর ব্যক্তিত্বকে দিয়াছে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ। যুবকের নাম জর্জ বার্নাড শ'। তিনি নিজ জীবনের কর্মপথ বাছিয়া লইলেন এবং সদর্পে ঘোষণা করিলেন: "My destiny is to educate London."—লণ্ডন, তথা ইংরাজ জাতি, তথা গোটা দুনিয়াকে সৎশিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত। এতো বড়ো একটা দুঃসাহসিক, আত্মবিশ্বাস-ব্যঞ্জক উক্তি অসাধারণ প্রতিভাধর বার্নাড শ'র মুখেই শোভা পায়। অসার দম্ভোক্তি শ' করেন নাই। তাঁহার সারা জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার মূল উপজীব্যই ছিল লোক-শিক্ষা। সমাজ জীবন, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষা, শিল্পকলা—সব কিছুর উপরই শ' হানিয়াছেন বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ব্যঙ্গের কশাঘাত। এই ব্রত উদ্‌যাপনে শ' নানা মাধ্যমের পরীক্ষা করিয়াছিলেন,—সভামঞ্চে বক্তৃতা, সাংবাদিকতা ও সর্বশেষে রঙ্গমঞ্চ। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া শ' এই সত্যই আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, শেষোক্ত অর্থাৎ অভিনয়-মঞ্চই লোক-শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

'Art for art's sake'—'শিল্পের জন্যই শিল্পসৃষ্টি'—একথা শ' মানিতেন না। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল 'Art for life's sake'—জীবনের প্রয়োজনেই শিল্পের প্রয়োজন। শ' বলিতেন: "For Art's sake alone, I would not face the toil of writing a single sentence."—"নিছক শিল্পসৃষ্টির খাতিরে আমি একটি পঙ্‌ক্তিমাত্রও লিখিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে নারাজ।" নাটক ও অভিনয়— এই দুই-এর ব্যবহার করিয়াছেন শ' তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র লোক-শিক্ষার প্রসারে।

আইরিশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায়ক বা সম্পূরক-রূপে আর একটি প্রাণবন্ত সংস্কৃতি-আন্দোলনের কথা আমরা জানি। তাহা হইল Celtic Revival movement—অর্থাৎ কেল্ট জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। এই আন্দোলনের হোতা ছিলেন কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স্‌। তাঁহার অভিমত : "No form of literary art reaches so large an audience as the acted drama." নৃত্যগীত, বক্তৃতা, বায়োস্কোপ, চিত্রপ্রদর্শনী, বেতার ইত্যাদি লোক-সংযোগের যাবতীয় মাধ্যমের মধ্যে শ্রোতৃবর্গের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে অভিনীত নাটক। বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা খুব বেশী। শহরে তো বটেই মফঃস্বল গ্রামাঞ্চলেও সিনেমার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু কোন একটি উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে যতটা প্রভাবান্বিত করিতে সক্ষম হয়, হাজার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষ করিতে হয়। তাহার ফলে কোন নাটকই তাহার পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। চলচ্চিত্রে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবং কম ব্যয়ে কর্মব্যস্ত মানুষ খানিকটা অবসর-বিনোদন করিবার সুযোগ পায় এবং ছবির পর্দায় উগ্র যৌন-আবেদন প্রকট হইয়া উঠে। প্রধানতঃ এই দুইটিই হইতেছে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

চলচ্চিত্র ও নাটকাভিনয়—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে ছায়া, কায়া, নকল ও আসলের মধ্যে যে পার্থক্য মনে হয় যেন তাহাই। আসল মানুষটি আর তাহার ফটো—এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, নাটকাভিনয় আর চলচ্চিত্রের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে কারণেই হোক, প্রকৃত লোক-শিক্ষার বাহনরূপে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ যে-ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, গত অর্ধশতাব্দীর চেষ্টাতেও চলচ্চিত্র বা ফিল্ম তাহা সম্ভব করিতে পারে নাই। জনপ্রিয়তার দিক দিয়া অবশ্য চলচ্চিত্রের সহিত নাটকাভিনয় পারিয়া উঠিতেছে না। আজ সস্তা জনপ্রিয়তার

প্রতিযোগিতায় ফিল্মের নিকট থিয়েটার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, যেরূপ আজ পরাভূত হইয়াছে হাল্‌কা সাহিত্যের কাছে ক্লাসিক বা সুসাহিত্য। কিন্তু কেবলমাত্র জনপ্রিয়তাই কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উৎকর্ষের অকাট্য প্রমাণ নহে। মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণে মাপকাঠিরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিক্ষা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মেজরিটির অনুরূপ প্রয়োগ অসমর্থনীয়। তাই ভোটাধিক্যে চলচ্চিত্রেব অধিকতর জনপ্রিয়তার দাবি সমর্থিত হইলেও জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের স্থান রঙ্গমঞ্চ বা নাটকাভিনয়েব অনেকখানি নিম্নে।

আবাব লোকরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবেও নাটকাভিনয় চলচ্চিত্র অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সিনেমা দেখিতে ব্যয় কম ও সময় কম লাগে,—ইহা সিনেমার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। কিন্তু সিনেমা আমদানিকরা জিনিস, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে একটা কিছু লোমহর্ষণ, চটকদার বা যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবি দেখাইয়া দর্শকেব চোখ ধাঁধাইয়া দিতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, documentary বা educational films—এ-পর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু documentary ছবির জনপ্রিয়তা সাধারণ commercial ছবির অপেক্ষা অনেক বেশী অল্প। বিলাতের ন্যায় দেশেও যেখানে স্কুলে প্রোজেক্‌টর সাহায্যে শিক্ষামূলক ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখানে সাধারণ সিনেমায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না, সে-দেশেও documentary ছবি তাদৃশ জনপ্রিয় নহে এবং না-হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। অর্থাৎ সিনেমা-শিল্প এপর্যন্ত যে ভাবে মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া পয়সা লুটিবার ব্যবসা করিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে তাহাতে জন-শিক্ষার মাধ্যমরূপে সিনেমা-শিল্প গড়িয়া উঠিবার ততটা সুযোগ পায় নাই। কোন একটা শখের নাটকাভিনয়ের আয়োজনে বহু-পরিমাণ পরিশ্রম

ও প্রস্তুতির আবশ্যক। এই প্রস্তুতিই একটা বড় রকমের শিক্ষা। আনন্দও বড় একটা কম নয়। কো-অপারেটিভ বা যৌথভাবে কাজ করিবার একটা বড় রকমের সুযোগ পাওয়া যায় নাটকাভিনয়ের আয়োজন, উদ্যোগ ও মহড়ার ভিতর দিয়ে। নাটক সাহিত্যেরই একটা বিশেষ অঙ্গ। অভিনয়ের ভিতর দিয়া নাট্যকারের সৃজনী প্রতিভা বাঙ্ময় হইয়া উঠে। সাহিত্যের উৎকর্ষ, ভাষার লালিত্য ও গানের মাধুর্য কেবল অক্ষরের নিগড়েই আবদ্ধ না থাকিয়া অভিনেতার কণ্ঠে ধ্বনিমুখর হইয়া উঠে, এবং অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রসাদে বাস্তব ও জীবন্ত-রূপ পরিগ্রহ করে। এইখানেই উপন্যাস-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্য— এই দুইয়েব মধ্যে একটা মামুলী পার্থক্য বর্তমান। এই অর্থে নাটক উপন্যাস-সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের যন্ত্ররূপে নাটক ও অভিনয়ের প্রয়োগ পৃথিবীর নানা দেশেই সাফল্য অর্জন করিয়াছে। প্রগতিশীল দেশমাত্রেই জাতীয় রঙ্গশালা বা ন্যাশনাল থিয়েটার জাতীয়-সংস্কৃতির মান উন্নয়নকল্পে জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগ লাভ করিয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবযুগ বা রেনাসাঁসের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহার একাধিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল বাংলাদেশে। আর, সেই নবজাগৃতি-আন্দোলনের একটা বড় মুখপাত্র ছিল তৎকালীন বাংলার রঙ্গমঞ্চ। নাটুকে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং পরবর্তী কালের নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকারগণের অবদান বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের গতিকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। বরিশালের মুকুন্দ দাসের উদ্দীপনাদৃপ্ত যাত্রাভিনয় আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বাণীকে দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। গণ-আন্দোলন ও

গণ-শিক্ষার মাধ্যমরূপে যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই লোক-শিক্ষার বাহনরূপে নাটকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় নাটক পৃথিবীর প্রাচীনতম নাটক। গ্রীক নাটক অপেক্ষাও ভারতীয় নাটক বয়োবৃদ্ধ। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নাট্রশাস্ত্রকে 'পঞ্চম বেদ'-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। দেব-দানবের যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হইয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হইলেন। তাঁহাদের বিজয়োল্লাসের অঙ্গরূপেই প্রথম নাটকের সৃষ্টি। বিভিন্ন বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঋষি ভরত যে নূতন শাস্ত্র রচনা করিলেন, তাহাই হইল 'নাট্যশাস্ত্র'—পঞ্চম বেদ। মুক্ত-প্রাঙ্গণে এই অভিনয় সুরু হইল। পরাজিত দানবেরাও অভিনয় দেখিতে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু অর্থাৎ দেবতাদের হাতে দানবগণের নিগ্রহ দানবদিগের উষ্মার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফলে অভিনয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল দানবগণ। তখন দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দানবদিগকে অভিনয় ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলেন। আর, তদবধি ব্রহ্মার আদেশে মুক্ত-প্রাঙ্গণে অভিনয়ের পরিবর্তে সুরক্ষিত নাট্যগৃহে অভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হইল।

এই উপাখ্যানের ভিতর হইতে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। আর্য ও উচ্চবর্ণ ভিন্ন অপর কাহারও বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ (তৎকালীন) শিক্ষালাভে অধিকার ছিল না। পঞ্চম বেদ অর্থাৎ নাটক সৃষ্টির একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার-সাধন। শিক্ষা-প্রসারের এই তাগিদ আজিও রহিয়াছে, চিরদিনই থাকিবে। লোক-শিক্ষার বাহনরূপে নাটক ও অভিনয়ের মূল্য কোন দিনই হ্রাস পাইবে না।



সামাজিক সংহতি

ধরাপৃষ্ঠ হইতে যে সব প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, যাহার একমাত্র উল্লেখ হয়তো আছে সাহিত্য বা ইতিহাসের পাতায়, সেইসব সভ্যতার বিলুপ্তিব অন্যতম কারণ হইতেছে—শ্রেণী-বৈষম্য এবং সামাজিক সংহতির অভাব। মানুষের সহিত মানুষেব সম্বন্ধ যখনই অস্বাভাবিক, বিকৃত ও বৈরভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই দেখা দিয়াছে সভ্যতার সৌধে ধ্বংসেব বিরাট্ ফাটল। একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেই। মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে তদানীন্তন হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছিল তেমনি একটা অবস্থা। সনাতন গুণ-কর্ম-বিভাগ বা বর্ণাশ্রমপ্রথা বিকৃত হইয়া সঙ্কীর্ণ জাতি-বিচাবে পর্যবসিত হইয়াছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের উৎপীড়নে তথাকথিত নীচ জাতিদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল একটা ত্রাহি-ত্রাহি ভাব। সমাজের সংহতি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তথাকথিত সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মুক্তির আশায় আক্রমণকারী বিদেশীয়গণকে পর্যন্ত সাদরে বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণের পূর্বেই সারা দেশ ছদ্মবেশী পঞ্চম-বাহিনীর চরে ছাইয়া গিয়াছিল। হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধ শ্রমণের দল অনুপ্রবেশ করিয়াছিল সমাজের আনাচে কানাচে। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর আগমনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী বিধর্মীর হাতে ব্রাহ্মণপ্রমুখ উচ্চশ্রেণীর লাঞ্ছনা সেকালের প্রোলেটারিয়েট কবির কাব্যানুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সেকালের সমাজ-চিত্রে দেশের এই শোচনীয় ঐক্যহীন অবস্থাটা বেশ প্রকট হইয়া রহিয়াছে। দেশ ও সভ্যতার সেই সঙ্কটের দিনে অভাব ঘটিয়াছিল জাতীয় সংহতির, অভাব ঘটিয়াছিল দেশাত্মবোধের, অভাব ঘটিয়াছিল সমাজ-চেতনার। হিন্দুভারতের পতনের একটা বড় কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ জাতিবিরোধ ও শ্রেণী-বৈষম্য।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন দেশে শ্রেণী-বৈষম্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখা যায়। কখনো দেখা যায় তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে বিরোধ—যেরূপ ঘটিয়াছিল হিন্দুভারতের পতনোন্মুখ অবস্থায়, অথবা যেরূপ ঘটিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কখনো দেখা যায় জাতিবিরোধ বা ধর্মবিরোধ,—যাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে বহুবর্ষব্যাপী ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্টদের ঝগড়া-বিবাদ, খ্রীষ্টান-ইহুদীসংঘর্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। কখনো সংঘর্ষ ঘটিয়াছে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক শ্রেণীহীন সমাজ (Classless Society) প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিলেন। শ্রেণীর আবার অনেক জাতি। রাজনৈতিক বা দলীয় শ্রেণী, সামাজিক শ্রেণী, অর্থনৈতিক শ্রেণী, বর্ণগত শ্রেণী ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতিগত, ধর্মগত এবং স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমান নাগরিকাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আইনের সাহায্যে একদিক দিয়া শ্রেণীবৈচিত্র্যের আংশিক বিলোপসাধন করা হইলেও শ্রেণী-বৈষম্যের আমূল বিলোপসাধন সম্ভবপর নহে। এই বিষময় সামাজিক ব্যাধি অনাবিষ্কৃত নূতন গুপ্তপথে আত্মপ্রকাশ করে। পলিটিক্যাল্ বা প্রোফেশন্যাল্ (Political and Professional) ক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে শ্রেণীবৈষম্য সমস্যার কিঞ্চিৎ লাঘব সম্ভব হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও সৌহার্দ্য ভিন্ন প্রকৃত শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠালাভ করে না। শ্রেণীহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথমই চাই সামাজিক সংহতি।

মানুষে মানুষে মন-কষাকষি

জনবহুল শহর, যেখানে মানুষ অর্থের চিন্তায় ব্যস্ত, সেখানকার সমাজের রূপ এক, আর জনবিরল মন্দগতি-জীবন পল্লীসমাজের চিত্র অন্যরূপ। শহরের সমাজে স্বার্থের ভিত্তিতে একপ্রকারের সংহতি

গড়িয়া উঠে। রাজনীতির সভামঞ্চে একই মতের পোশাকে বহু মানুষ একত্র মিলিত হয় ইহা একপ্রকার সংহতি। আবার, একই পেশার মানুষ পরস্পরের প্রতি কিছুটা দরদী হয়; ইহাও একপ্রকার সংহতি। শহরে হয়তো নিজের পাশের বাড়ীর বা ফ্ল্যাটের মানুষের খোঁজ রাখিবার আদৌ প্রয়োজন বা অবকাশ হয় না, কিন্তু বিশেষ স্বার্থের খাতিরে বহু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও একটা ঐক্যবোধ বা সংহতি গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই ঐক্যবোধ একান্তই স্বার্থসাপেক্ষ এবং বাস্তবধর্মী। ইহার পশ্চাতে মানুষের সুকুমার ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা অতি সামান্যই আছে। পল্লীসমাজে নানা দলাদলি, নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব পল্লীসমাজের আওতায় যেরূপ সহজে গড়িয়া উঠে, জনাকীর্ণ, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-কণ্টকিত শহরের জীবনে তাহার সেভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ কোথায়?

বর্তমান শিল্পপ্রধান সভ্যতার অন্যতম প্রধান সমস্যা ধনী-নির্ধনের ভিতরকার বৈষম্য। অর্থ কেবল জীবনের আরাম-আয়েশ বিলাস ও ব্যসনের উপকরণই যোগায় না, অর্থ-ই সামাজিক মর্যাদারও মানদণ্ড এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস। অর্থের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আজিকার দিনের সমাজ-বিন্যাস। মানুষে মানুষে মনকষাকষির মূল কারণও আর্থিক অসাম্য। সাম্যবাদ ও সোস্যালিজ্‌মের মূল কথাই হইতেছে জাতীয় ধনসম্পত্তির সমবণ্টন এবং মানুষের আর্থিক অবস্থার সমতা বিধান।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মনকষাকষি হ্রাস করিবার একটা উপায়ের নির্দেশ দিতেছে সাম্যবাদ। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার বা অবস্থার সমতা বিধান করা হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মনে মানুষের প্রতি সমভাবের উদয় হয়, ততক্ষণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন কৌশলই সামাজিক মনকষাকষির (social tension) স্থায়ী অবসান ঘটাইতে পারিবে না। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদের ভিত্তি সংবিধানেও নিহিত থাকে না—মানুষের মনই

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। সুষ্ঠু মনের জন্য চাই সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা।

গণযুগের দিনে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা আজ আর মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নহে। প্রকৃতির দান আলো, বায়ু ও জলের উপর যেমন মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার; তেমন শিক্ষার উপরেও সকলের মৌলিক অধিকার আজ সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সর্বজনীন স্বীকৃতির বাস্তব অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় জগতের প্রগতিশীল দেশগুলিতে—জনশিক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থায়।

আমাদের এই প্রাচীন দেশে অতীতে এই মহিমময় সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল। সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাই মানুষের মনের জমিকে সরস সমৃদ্ধ রাখিয়াছে যুগে যুগে। লোকরঞ্জনের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রধানতঃ এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হইত। কোন কালেই এদেশে ইস্কুল-কলেজের এত বাহুল্য ছিল না, যেমনটা দেখা যায় আজিকার দিনে। পল্লীপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় ইস্কুল-কলেজের পোশাকী শিক্ষার ততটা প্রয়োজনও তেমন ছিল না। গ্রাম্য-পঞ্চায়েত, গ্রামশাসন, লোকচিত্ত-বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রাম-গণ্ডীর অভ্যন্তরে গ্রামের লোক নিজেরাই করিয়া লইত। যেমন এদেশে তেমন অন্য দেশেও অতি প্রাচীনকালে এমন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া জানা যায়, যেখানে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে গাঁয়ের সকল লোকই একত্র মিলিত হইবার সুযোগ পাইত। গ্রাম্যসমাজের সম্প্রসারণ, শহুরে ও শিল্পপ্রধান সমাজের গোড়াপত্তন, বিজ্ঞানের প্রসার এবং দ্রুতগামী যানবাহনের প্রচলন ইত্যাদি কারণে প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীর এবং সেই সঙ্গে পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিলোপ বা বিকৃতি ঘটিল। পল্লীসমাজের সংহতি বহুলাংশেই সংরক্ষিত হইত এই সকল প্রতিষ্ঠানের আধুনিক ইংরাজী নাম—Community Centre। ইহার একটি সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। প্রাচীন দিনের চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারীতলা হয়তো আধুনিক অভিরুচির মাপকাঠিতে সর্বাংশে

গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হইতে পারে। আসাম অঞ্চলে একটি গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায়, তাহার নাম 'নামঘর'—গাঁয়ের লোকের একত্র মেলামেশার জায়গা। নামটি সুনির্বাচিত। উত্তর ভারতের বহু জায়গায় 'পঞ্চায়েত ঘর' দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'চৌপল'।

কম্যুনিটি সেণ্টার বা সর্বজনীন মিলনকেন্দ্র

নাম যাহাই হউক না কেন, প্রতি গ্রাম বা জনপদে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন, যেখানে মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক বা আর্থিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিবেশী হিসাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে; যেখানে জনপদের প্রত্যেক অধিবাসীর থাকিবে সমান প্রবেশাধিকার। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর সঙ্গে প্রত্যেক জনপদবাসীর থাকিবে সানন্দ ও স্বেচ্ছাকৃত সংযোগ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইবে ইহার সর্বজনীনতা। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইবে গোলটেবিল বৈঠকের নীতি অনুসারে (Round Table Technique)—অর্থাৎ সভাপতি, সম্পাদক বা অন্য কর্মকর্তার কোন বিশেষ মর্যাদা বা ক্ষমতা থাকিবে না। প্রতিটি সভ্যই সম মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করিবে। কম্যুনিটি সেণ্টার সমস্ত শ্রেণীগত বিভেদ-ব্যবধানের অবসান ঘটাইবে—এমন একটা বড় দাবি করা যায় না। পরন্তু এই সকল বিভেদ ব্যবধান থাকা সত্বেও কম্যুনিটি সেণ্টারে সর্বসাধারণ একত্র মিলিত হইতে পারিবে ঐক্য ও সখ্যের ভিত্তিতে এবং এই একত্র মিলনের ফলেই tension বা মন কষাকষির ঘটিবে লাঘব বা অবসান।

কাজ ও আনন্দ

নিজে একটি আনন্দ উপভোগ করা আর বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করা,—এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি।

যে আনন্দ অপর দশ জনের সাহচর্যে উপভোগ করা যায়, তাহার সামাজিক মূল্য অনেক বেশী। সুস্থ সমাজগঠনের পক্ষে নির্দোষ লোকরঞ্জনের অপরিহার্যতা সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কম্যুনিটি সেণ্টারগুলির মাধ্যমে লোকচিত্ত বিনোদনের নানা আয়োজনই করা যাইতে পারে। জনপদের বিভিন্ন সামাজিক বা আর্থিক স্তরের লোকই এসকল আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিবে। এখানে গান, অভিনয়, কথকতা, পাঠ, ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী প্রভৃতি নানারূপ, আনন্দানুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বাহির হইতে ভাড়াটে বা শখের থিয়েটার দল না আনিয়া এখানে স্থানীয় লোকেরাই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কেবল আনন্দানুষ্ঠানই নয়, শিক্ষা, সমাজসেবা শিল্প ইত্যাদির অনুশীলনও হইবে এইসব কেন্দ্রে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাতঃকালে শিশুদের পাঠশালা, দ্বিপ্রহরে মহিলা সমিতি, বিকালে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা ও সন্ধ্যায় বড়দের লেখাপড়ার আসর ও সান্ধ্য বৈঠক বসিতে পারে। কম্যুনিটি সেণ্টারের সংলগ্ন থাকিবে একটি গ্রন্থসংগ্রহ ও পাঠাগার। গাঁয়ের কারিগর তাহার যন্ত্রপাতি মেরামত করিয়া লইতে পারিবে কম্যুনিটি সেণ্টারের ছোটখাট কারখানায়। একটি ফার্স্ট এড-বক্স বা প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ কম্যুনিটি সেণ্টারে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। একটি ম্যাটারনিটি ব্যাগ বা প্রসবের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও এখানে রাখা উচিত। প্রয়োজন মত গাঁয়ের লোকেরা তাহাদের নানা আত্যন্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই কম্যুনিটি সেণ্টারেই পাইতে পারিবে। একটি ছোটখাট সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম গড়িয়া তুলিতে হইবে এই কম্যুনিটি সেণ্টারে। সংক্ষেপে গ্রাম্য কম্যুনিটি সেণ্টারটি হইবে গাঁয়ের লোকের শিক্ষাকর্ম-আনন্দানুষ্ঠান কেন্দ্র। উৎসবের দিনে ধনীর দুয়ারে রবাহূত আগন্তুকের ন্যায় অবাঞ্ছিত অবস্থার পরিবর্তে গ্রামের সর্বজনীন অনুষ্ঠানে সবাই ভোগ করিবে সমানাধিকার।

পরিচালনা

গাঁয়ের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোকের সম্মতিক্রমে একটি প্রতিনিধিমূলক পরিচালকমণ্ডলী কম্যুনিটি সেণ্টারের কার্য নির্বাহ করিবেন। পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্যগণ হইবেন অবৈতনিক এবং পালাক্রমে পরিবর্তনশীল।

কিন্তু কেন্দ্রের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান-সূচীর যথাযথ পরিচালনার জন্য থাকিবে একজন সংগঠক এবং কাজের পরিমাণ অনুসারে একজন বা একাধিক সহকারী। বর্তমানে পাঁচশালা শিক্ষা পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকুল্যে যে-সব কম্যুনিটি সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার ব্যয়ভারের সবটাই অবশ্য সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হয়। কিন্তু সমগ্র না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ব্যয়ভার স্থানীয় লোকের চাঁদা বা দানে নির্বাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট (ক)

শিক্ষা ও সাক্ষরতা

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ নানাভাবে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিতেছে। আমরা দেখিয়া শিখি, ঠেকিয়া (স্পর্শ করিয়া অর্থে) শিখি এবং শুনিয়া শিখি। প্রকৃতির বিরাট্ পাঠশালায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা প্রতি মুহূর্তেই শিক্ষা অর্জন করিতেছি।

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হ'তে ভাই রে;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

মানুষ প্রগতিশীল। প্রকৃতির শক্তিকে নানা কৌশলে আয়ত্ত করিয়া মানুষ নিজের কাজে লাগাইয়াছে। প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে নানা জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। দেশ কাল ও দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া একের আহৃত জ্ঞানরাশি সারা জগতের কল্যাণে বিতরণ করিতেছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। আবার অপর পক্ষে শিক্ষা-বিস্তার বা প্রচারের-মাধ্যম হিসাবে আজকাল যে-সকল বৈজ্ঞানিক কৌশল, যথা—চলচ্চিত্র, রেডিও, দূরেক্ষণ ইত্যাদির বহুল ব্যবহার চলিতেছে, তাহার উপরেও একান্ত নির্ভর করিয়া থাকা সম্ভব নহে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ছাপার অক্ষরকে

বাদ দেওয়া চলিতে পারে না। এমন এক সময় ছিল, যখন অক্ষর-জ্ঞানহীন হইয়াও কোন ব্যক্তির পক্ষে সংসারের দশটা কাজ চালাইয়া যাওয়া খুব অসুবিধাজনক হইত না। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে উহা খুব সহজসাধ্য নহে। ছাপাখানা ও মুদ্রণশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আহৃত জ্ঞান, মানুষের ভাবধারা ও নিত্য নব আবিষ্কারের ফল সারা জগৎ-ময় প্রচারিত হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে মানুষের নিত্য নব অবদানের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে ছাপার অক্ষর তথা লিখিত অক্ষরের সাহায্য বর্জন করা চলিবে না। শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম যতপ্রকারই থাকুক না কেন, প্রত্যক্ষ মাধ্যম হিসাবে অক্ষর-পরিচয় সর্বাগ্রগণ্য ও অপরিহার্য।

জনশিক্ষা-প্রসারের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আক্ষরিক শিক্ষা বা 'লিটারেসি এডুকেশন'-এর কথা ভাবিতে হয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই নিরক্ষর। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের সদর দরজাই তাহাদের নিকট অবরুদ্ধ। Government of the people, for the people, by the people—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার এই মৌলিক নীতি স্বীকার করিয়া লইলে জনসাধারণের জন্য সর্বজনীন আক্ষরিক শিক্ষা বা 'ইউনিভারস্যাল লিটারেসি এডুকেশন'-এর ব্যবস্থা না করিয়া গত্যন্তর নাই। ডিমোক্র্যাসি ও ইউনিভারস্যাল লিটারেসি—এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। ন্যূনকল্পে সর্বজনীন অক্ষর-পরিচয় ডিমোক্র্যাসির প্রথম ও প্রধান শর্ত। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আপামর জনসাধারণের দায়িত্ব এবং অধিকার একটা বড় কথা। নিরক্ষর ভোটার জোড়া বলদ, তৈলপ্রদীপ, বৃক্ষ বা এই-জাতীয় অন্য কোন প্রতীক-চিহ্নিত বাক্সে ভোটপত্র বা ব্যালট-পেপার নিক্ষেপ করিয়া তাহার ভোটাধিকার অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতই সিদ্ধ হইল কি?

নাগরিক জীবনের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দায়িত্ব-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি কাজের তাগিদেও আক্ষরিক শিক্ষার অনিবার্য প্রয়োজন আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চিঠিপত্র লেখা, খবরের কাগজ পড়া, রেল বা স্টীমারে যাতায়াত করা, আইন-আদালতের কাজে, থিয়েটার-সিনেমায়, রাস্তা-ঘাটে এবং হাটে-বাজারে—প্রতি ক্ষেত্রেই

লিটারেসি বা আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিল্প-প্রধান (industrial) বা শহুরে (urban) সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রয়োজনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপে লিটারেসি-আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা মহাবীর নেপোলিয়ন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তাঁহার আদেশনামা-প্রচার এবং সেই আদেশনামার তাৎপর্য বুঝাইবার মাধ্যম হিসাবে তিনি লিটারেসি-শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। আজকাল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং দলীয় প্রচারের (Party propaganda) কল্যাণেও লিটারেসি-শিক্ষার বহুল প্রসার হইতেছে। আধুনিক প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা-পাব্লিসিটির প্রধান অস্ত্রই হইতেছে লিটারেসি। ছাপা-অক্ষরের শক্তি অপরিসীম। সেইজন্যই Press বা ছাপাখানাকে 'Fourth Estate' বলা হইয়া থাকে।

আত্মশিক্ষা বা self education-এর প্রধান উপায় লিটারেসি। সিনেমা, রেডিও, বক্তৃতা ইত্যাদি শিক্ষা-মাধ্যম যাহা করিতে না পারে, লিটারেসি তাহাই সম্ভব করিয়া তোলে। জগতের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি হইতেছে লিটারেসি। ইহারই প্রসাদে মানুষ আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। একজন সাক্ষর এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যেকার প্রভেদও হইতেছে এই আত্মবিশ্বাস বা আত্মনির্ভরতা।

Haves and Have-nots, Classes and Masses, Capitalist and Proletariat ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ-জ্ঞাপক নানাপ্রকার বুলি আমরা শুনি। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ হইতেছে—literate and illiterate, সাক্ষর ও নিরক্ষর। সভ্য মানুষের শিক্ষা-প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি এবং প্রধান সোপান হইল লিটারেসি। শিক্ষা-প্রসারের জন্য আমরা যত-প্রকার কৌশলই অবলম্বন করি না কেন, লিটারেসিকে কোনমতেই বাদ দেওয়া চলিবে না।

দেশজোড়া নিরক্ষরতা-সমস্যার সমাধান জনশিক্ষা-আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, অক্ষর-জ্ঞানই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার দৃঢ় বুনিয়াদের উপরেই দেশ ও সমাজগঠনমূলক যাবতীয় পরিকল্পনা সফল হইতে পারে। শিক্ষাকে বাদ দিয়া বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়াস অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী স্থাপন করিবার মতই হাস্যকর।

পরিশিষ্ট (খ)

জনশিক্ষার সিলেবাস

সূচনা

আমাদের জনশিক্ষা-কেন্দ্রসমূহে যে-সকল বিষয়ের পাঠ ও পরিশীলন হইবে, তাহার একটি মোটামুটি সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল। অজ্ঞ ও নিরক্ষর নরনারীকে কি কি বিষয় পড়াইতে ও শিখাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক জীবনের সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয়-স্থাপনই হইতেছে জনশিক্ষার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে অধীত একাধিক বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সময় অতি অল্প। পরবর্তী শিক্ষা বা further education-এর জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; ইহার ক্ষেত্র ও প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। কিন্তু জনশিক্ষা-সমস্যার যে-বিশিষ্ট দিকটির প্রতি আশু মনোযোগ দিতে হইবে, তাহা হইতেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা দূর করিয়া দেশের আপামর জনসাধারণকে 'পরবর্তী শিক্ষার' জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই আমাদের আন্দোলনের সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য।

শিক্ষণ-সময়

একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতিটি গ্রাম্য কেন্দ্রে এক-এক বারে অন্ততঃ ৩০।৩৫টি বয়স্ক-বয়স্কার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং প্রতিটি দলের জন্য তিন মাস সময় দিতে পারিলে বৎসরে প্রায় ১০০ জনকে সাক্ষর করিয়া তুলিতে পারা সম্ভবপর। সুতরাং অনধিক তিন মাসের মধ্যেই চলনসই অক্ষর-জ্ঞান এবং তৎসহ অন্যান্য অতি-প্রয়োজনীয় কিছুটা প্রাথমিক ধারণা জন্মাইতে না পারিলে এই আন্দোলনকে কার্যকর করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সাক্ষরতা-অর্জনের পক্ষে মাত্র তিন মাস সময় যথেষ্ট কিনা। বয়স্কশিক্ষা-সমস্যাটি এখনও পর্যন্ত পরীক্ষামূলক—অন্ততঃ ভারতে।

সুতরাং আপাততঃ এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে। সুখের বিষয়, বহুল-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাশাস্ত্রবিদ্‌গণের অভিমত তিন মাসের সপক্ষেই সাক্ষ্যদান করিতেছে। 'Rural Adult Education' গ্রন্থে Landis and Willard যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনায় (South Carolina) অনুষ্ঠিত জনশিক্ষা-আন্দোলনের ফলাফল বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, মাত্র এক মাসের চেষ্টাতেই বয়স্ক-বয়স্কাগণ পঠন, লিখন ও সাধারণ পাটীগণিত আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মালয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ লাওব্যাকও তিন মাসই সাক্ষরতা-অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট,—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা হইতেও এই মত সমর্থিত হয়। সাধারণ অক্ষর-পরিচয় এবং নিত্যকার জীবনযাত্রার জন্য যতখানি হিসাব-শিক্ষার প্রয়োজন, ততখানি শিক্ষা করার পক্ষে তিন মাস সময় যথেষ্ট।

সুতরাং তিন মাসের উপযোগী করিয়াই আপাততঃ এই সিলেবাসটি বিরচিত হইয়াছে। এই সিলেবাসে যে-সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, এইসব বিষয় ছাড়াও এমন আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা প্রত্যেক নরনারীর সাধারণভাবে জানা উচিত। কেবল তাহাই নহে, এই সিলেবাসে লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও যেটুকু জানিবার কথা, তাহা অপেক্ষাও আরও বেশী অনেক কিছুই জানিবার আছে। ফলকথা, জনশিক্ষার প্রসার কোন একটা বাঁধা-ধরা ও সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। সময়, শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানসিক বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচারসাপেক্ষ বয়স্কশিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারে। সাক্ষরতা-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান জন্মিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমান সিলেবাসটি রচিত হইয়াছে। ইহাকে বাধ্যতামূলক বা অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে।

শিক্ষণ-পদ্ধতি :

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। পূর্বে একথা বহুবার বলিয়াছি যে, বয়স্ক-বয়স্কাদের শিক্ষা-দান ব্যাপারটি শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। প্রকৃতপক্ষে বয়স্কদিগকে প্রচলিত অর্থে 'পড়ান'

সম্ভব নহে। একটি প্রীতিকর ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে গল্প ও আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া বয়স্ক-বয়স্কাদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা না করিতে পারিলে সুফল আশা করা যাইবে না। প্রচলিত বক্তৃতা-প্রণালী (lecture method) বা গুরুমহাশয়গিরি (tutoring) এক্ষেত্রে একেবারেই অচল। শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এই উভয় বিষয়েই শিক্ষককে যথেষ্ট পরিমাণে উদার মনোভাবাপন্ন ও প্রগতিপন্থী হইতে হইবে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

এই সিলেবাসে মাতৃভাষা, পাটীগণিত, স্বাস্থ্য, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সমাজশাসন-বিধি ও কুটীর-শিল্প—মোট এই আটটি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর (contents) উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে পাঠদান-প্রণালীরও একটু আভাস দেওয়া হইল। যদিও পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবু আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক যে, পাঠ্যবিষয়বস্তু ও পাঠদান-প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কোন নির্দিষ্ট সূত্রের দ্বারা শিক্ষণের মৌলিকতা এতটুকু খাটো বা ব্যাহত করা উদ্দেশ্য নহে।

বাস্তবক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতায় এই সিলেবাসের পরিবর্তন ও পরিমার্জন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

১। মাতৃভাষা

জনশিক্ষা-আন্দোলনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতই মহান্ ও ব্যাপক হউক না কেন, উহার উদ্দেশ্য যে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। আক্ষরিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রথম সোপান।

কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিলে নিরক্ষর বয়স্ক-বয়স্কাদিগকে অতি সহজে এবং অল্প সময়ে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তোলা যায়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

(ক) বর্ণপরিচয়-পদ্ধতি :

আমাদের চিরাচরিত বর্ণ-পরিচয়-পদ্ধতির (Alphabet Method) কথাই প্রথমে বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়-

সমূহে আবহমান কাল হইতে এই প্রণালীতেই শিক্ষারম্ভ করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, বর্ণমালার সহিত পরিচয়-স্থাপন হইতেই প্রায় একবৎসর বা ততোধিক সময় অতিবাহিত হয়। শিশুরা যন্ত্রচালিতবৎ বর্ণমালার অক্ষরগুলি টালা মুখস্থ করিয়া যায়। অভ্যাসের বশে তাহারা অ-আ-ই-ঈ আবৃত্তি করিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের আঙ্গুল উচ্চারণের বহু পিছনে পড়িয়া থাকে। **অ** হইতে **ঔ** এবং **ক** হইতে **হ** পর্যন্ত একটানা মুখস্থ বলিয়া যায়, কিন্তু অক্ষরগুলি ভালভাবে চিনিতে পারে না। বড়দের বর্ণপরিচয় এই মুখস্থ-পদ্ধতিতে চলিতেই পারে না। কারণ, সময় অত্যন্ত অল্প এবং বড়দের পক্ষে এত দীর্ঘদিন ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই মামুলী প্রথার পরিবর্তন আবশ্যক কিনা, বিশেষজ্ঞগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

(খ) মূলশব্দ-পদ্ধতি :

বর্ণপরিচয়-পদ্ধতি ছাড়া আর যে-দুইটি পদ্ধতির কথা আজকাল বয়স্ক-শিক্ষা-প্রসঙ্গে প্রায়ই শুনা যায়, তাহা হইতেছে ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক সি. লাওব্যাক কর্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপে প্রবর্তিত মূলশব্দ-পদ্ধতি অথবা Key-word method; মূলশব্দ-পদ্ধতিতে প্রথমেই এমন গুটিকতক শব্দ বাছিয়া লওয়া হয়, যাহার সাহায্যে অনেকগুলি শব্দ অতি সহজে ও শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া ফেলা যায়। উহাদের স্বরূপ 'কলম' এই মূল শব্দটি হইতে ধরা যাইতে পারে। শব্দটি অতি-পরিচিত ও সচরাচর-প্রচলিত। ইহার অন্তর্ভুক্ত বর্ণগুলির স্থান পরিবর্তন করিয়া ও তাহাদের সহিত আ-কার ই-কার ইত্যাদি যোগ করিয়া প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৫০টি শব্দ পাওয়া যায়। এইরূপ ৪।৫টি মূলশব্দ আয়ত্ত করিবার পর সেই শব্দগুলির সমবায়ে গঠিত বাক্য পড়িবার অভ্যাস করাইতে হয়। ১০।১২টি মূলশব্দ আয়ত্ত করিবার পর শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। বঙ্গীয় বয়স্ক-শিক্ষা-সমিতির 'জনশিক্ষা সহচর'-গ্রন্থে মূলশব্দ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

(গ) বাক্য-পদ্ধতি :

Sentence Method বা বাক্য-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যাপক অনাথ-নাথ বসু-কৃত 'বড়দের পড়া'য়। মূলশব্দ-পদ্ধতি ও বাক্য-পদ্ধতির মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য বা ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলি পরিচিত শব্দের সমবায়ে গঠিত সহজ ও সরল বাক্য লইয়া পাঠদান সুরু করা হয় এবং সেই বাক্যের অন্তর্গত শব্দের বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণ বা অক্ষরগুলিকে

চিনাইয়া দেওয়া হয়। ফলকথা, মূলশব্দ-পদ্ধতি এবং বাক্য-পদ্ধতি উভয়ই পরীক্ষামূলক। অভিজ্ঞতার বিচারে শেষ পর্যন্ত কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক সুফল-প্রসূ হইবে, তাহা এখন নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

লেখা ও পড়া ঃ

লেখা-পড়া একই সঙ্গে শিখাইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক-বয়স্কারা প্রথমেই তাহাদের নিজ নিজ নাম লিখিতে শিখিতে চাহিবে; কেননা, দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে না পারা একটা লজ্জাকর ব্যাপার এবং নানা অসুবিধার কারণ।

বাংলা বর্ণগুলি কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। এই বর্গবিভাগ উচ্চারণমূলক, যথা—**ক, খ, গ, ঘ, ঙ** ইত্যাদি। কিন্তু লেখা-পড়া একই সঙ্গে শিখাইতে হইলে উচ্চারণ-ঘটিত বর্ণ-বিভাগ মানিয়া চলা অপেক্ষা অক্ষরগুলির আকৃতিগত সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে অধিক শীঘ্র সুফল পাওয়া যাইবে। যেমন, এক ব—এই অক্ষরটির সামান্য পরিবর্তন দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই **র, ক, ঝ, ধ, ঋ**—এই পাঁচটি অক্ষর চিনিতে পারা সহজ। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, আকৃতিগত সাদৃশ্যে বাংলা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে গ্রুপ (Group) বা বর্গে বিভক্ত করা চলে।

অঙ্ক লেখা ঃ

অক্ষর-পরিচয় ও লিখনের পূর্বেই বাংলার ০ হইতে ৯ পর্যন্ত অঙ্কের সহিত পরিচয় ও উহা লেখা অভ্যাস করান উচিত। সংখ্যা-লেখা আয়ত্ত হইলে অক্ষর-লেখাও অল্প-আয়াসসাধ্য হইবে। শূন্য হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও পড়া সহজ হইয়া আসিলে, দুইটি অঙ্ক-যোগে সংখ্যা রাখিতে শিখাইয়া দেওয়া উচিত।

অঙ্ক লেখা **শূন্য** হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এক শূন্যকে বিকৃত করিয়া **এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট** ও **নয়** লেখা সহজ হয়।

তাহার পর বাংলায় হিসাব রাখিবার মূল ভগ্নাংশগুলি—এক আনা হইতে ষোল আনা পর্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শেখান দরকার।

নূতন বিধিতে অক্ষর লিখিতে শেখা ঃ

ভগ্নাংশ লিখিতে গিয়া যে ছাত্র **৸৹** শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে **দ** লেখা সহজ হইবে।

দ লিখিবার পর ব লেখা সহজ। ব হইতে র, ক, ধ, ঝ, ঋ লিখিতে মোটেই কষ্ট হইবে না। এই বর্ণগুলির যোগে যে চলতি শব্দগুলি জানা আছে, সেইগুলি এইবার অভ্যাস করান যাইতে পারে।

তাহার পরে আ-কার-যোগে দা, বা, রা, কা, ধা-র সাহায্যে বহু শব্দ লিখিতে ও পড়িতে শেখান দরকার।

া আ-কারকে মূল ধরিয়া ন, ণ, ম, ল লিখিতে অভ্যাস করা সহজ হইবে। তাহার পর আ-কার-যোগে না, ণা, মা, লা শিখিলে বহু শব্দ লিখিতে ও পড়িতে পাবা যাইবে। এইরূপে ৩-এ মাত্রা দিলে ত, এবং ত হইতে ভ, অ, আ, ও এবং ঔ লিখিতে পারা অল্প-আয়াসসাধ্য মনে হইবে।

তাহার পর ছাত্র ৬-এ মাত্রা দিয়া ড, এবং ড হইতে ভ, ড়, জ, ঙ, উ, ঊ লিখিতে পড়িতে সহজেই শিখিতে পারিবে।

৭ হইতে এ তাহার পর ঐ এবং এঃ লেখা ও পড়া খুব সহজ মনে হইবে।

১ হইতে ঠ, গ, স, শ লেখা সহজ এবং ৮ হইতে ট, ঢ, ঢ়, চ, ছ লিখিতে চেষ্টা করিলে মোটেই কষ্ট হইবে না।

বাংলায় ঈ লেখা বড় কঠিন, বিশেষতঃ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। কিন্তু ৵০ দুই আনার অঙ্কের শূন্য বাদ দিয়া ডান দিকে একটি চাপাংশ (arc) যোগ করিয়া এবং মাত্রা দিয়া, মাথায় একটি আঁকড়ি দিলেই সুন্দর ঈ লেখা হইবে।

২ হইতে য, য়, ষ, ফ, খ, ঘ, হ, ই, থ লেখা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

০ হইতে ং, ঃ, ँ, এবং ৎ লেখা খুবই সহজ।

ধ্বনিতত্ত্বের অনুরোধে প্রচলিত বর্ণ বিন্যাস-অনুযায়ী ক, খ, গ, ঘ—এইভাবে না শিখাইয়া আকৃতিগত সাদৃশ্যের সাহায্যে বর্ণপরিচয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্প-আয়াসসাধ্য হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণ শেখান বর্ণ যোগ করিয়া শব্দ শেখান অপেক্ষা সহজ।

বাংলা বর্ণশিক্ষা বা অক্ষর-পরিচয়ের- সর্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষরগুলিকে ভাঙ্গিয়া হসন্ত দ্বারা প্রকাশ করিবার রীতি প্রচলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করা ভিন্ন গতি নাই। বাংলা যুক্তবর্ণের সংখ্যা অনেক। তবে য, র, ল, ব, ন ও ম-যোগে আর ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং শ, ষ, স-সহ যে-সব যুক্তবর্ণ গঠিত হয়, সেগুলি শিখিতে পারিলেই অধিকাংশ যুক্তাক্ষর শেখা যায়। কতকগুলি বর্ণের যুক্ত-আকার বর্ণ দুইটির আসল আকার হইতে

ভিন্ন রকমের, যথা—ক+ত=ক্ত, দ+ধ=দ্ধ, ত+থ=ত্থ ইত্যাদি। আবার, গুরু, রূপ, শুভ, হৃদয়, ত্রুটি, ক্রমে, হুতাশন প্রভৃতি শব্দ কেহই গুরু, রূপ, শুভ, হ্রিদয়, ত্রুটি, ক্রমে, হুতাশন লেখেন না। একমাত্র বাংলা লিনোটাইপে ও টাইপরাইটিং মেশিনে শেষোক্ত ভঙ্গীতে অক্ষর ছাপা হইতেছে। বর্ণপরিচয় করাইতে শিক্ষকের এই সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতেই হইবে।

যুক্তবর্ণের বেলায় বিশ্লেষণ রীতির পরিবর্তে সংযোগ-রীতির অনুসরণই হইবে অধিকতর কার্যকরী। শিক্ষার্থিগণ যাহাতে ধাপে ধাপে অবাধে অগ্রসর হইতে পারে, সেইজন্য প্রতিটি নূতন পাঠে শিক্ষার্থীদের নূতন অক্ষরের পূর্বে পরিচিত অক্ষর যোগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিতে হইবে। যেমন প্রথমপাঠে দ, ব, র, ক, ধ, ঝ—এই বর্ণ কয়টির সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকিলে দ্বিতীয় পাঠে ইহাদের যোগে আরও দুইটি কি তিনটি নূতন বর্ণ শিখান যাইতে পারে। যথা—কত, রত, কও, রও, অথবা বন, বল, কল, খল, লব, নর, রণ ইত্যাদি।

নূতন পাঠ দিবার সময় পুরাতন পাঠের কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। প্রচলিত শব্দটির চিত্র প্রদর্শন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে শব্দটি উচ্চারণ করিতে বলিলে এবং উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত অক্ষরটির সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটাইয়া দিলে অক্ষর-পরিচয় সহজ হইবে। অবশ্য, সব ক্ষেত্রেই ছবির সাহায্য লওয়া সম্ভব হইবে না।

শিক্ষক মহাশয় নিজে যথাসম্ভব কম কথা বলিয়া শিক্ষার্থীকেই কথা বলিবার সুযোগ দিবেন।

মূলশব্দ ও বাক্য-পদ্ধতির সংশ্লেষণ (Synthesis):

ডাঃ লাওব্যাকের মূলশব্দ-পদ্ধতি ও বাক্য-পদ্ধতি—এই উভয়ের সমন্বয়ে বা মধ্যবর্তী কোন প্রণালী অনুসরণ করিয়া নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রাথমিক পাঠ আরম্ভ হইতে পারে।

দেখা গিয়াছে যে, একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তি মোটামুটি ১০০০ হইতে ১৫০০ সদাপ্রচলিত শব্দের সাহায্যে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং প্রথমেই যদি ১০০০ শব্দ-সংবলিত একটি সদাপ্রচলিত শব্দ-তালিকা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরিচিত শব্দ চয়ন করিয়া পাঠ রচনা করিবার সুবিধা হইবে। প্রথম কয়েকটি পাঠ সরল ও যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষরবিহীন পরিচিত শব্দের সাহায্যে রচিত হইবে।

উক্ত তালিকা হইতে শব্দ নির্বাচন করিবার সময় শব্দের বর্ণগুলিকে যতদূর সম্ভব ইতঃপূর্বে উল্লিখিত আকৃতিগত বিভাগ হইতে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করা উচিত। একটু নমুনা দেওয়া গেল :

'বড় বাড় বাড়িলে ঝড়ে পড়ে যায়'—বাক্যটি অর্থযুক্ত এবং বাক্যটির প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের পরিচিত। **ব** বর্ণটি দিয়া আরম্ভ করিয়া **ঝ, য** ও **য়**—এই তিনটি বর্ণ একই পাঠে শেখান যায়।

বর্ণগুলির আকৃতিগত সাদৃশ্য, মূলশব্দ-পদ্ধতি ও বাক্য-পদ্ধতি—এই তিনের সমন্বয়ে বয়স্কদের প্রথম পাঠটি রচিত হইলে একটা নূতন জিনিসের সৃষ্টি হইবে।

পাঠদান প্রণালী :

বড়দের কি ভাবে শিখাইতে হইবে, সে-সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। ছোটদের অপেক্ষা স্মরণশক্তি কম হইলেও বড়দের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও শিখিবার আগ্রহ অনেক বেশী।

পাটীগণিত শিখাইবার জন্য প্রথমে একটি কার্যসূচী প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। ধরিয়া লওয়া যাক যে, তিনমাস-কালের মধ্যে সাক্ষরতা, পাটীগণিত ও অন্যান্য বিষয়ে একটা মোটামুটি চলনসই জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে ১৫ দিন বাদ দিয়া ৭৫ দিন প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়ার কাজ চলিতে পারে। প্রতিদিন যদি ২ ঘটা কেন্দ্রের কাজ চলে, তবে তাহার মধ্যে ১ ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, গান, রেডিও, অভিনয় ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় এই সময়ের মধ্যে পালাক্রমে মৌখিকভাবে গল্প ও আলাপ-আলোচনাচ্ছলে শিখাইতে হইবে। বাকী ১ ঘটায় মাতৃভাষা ও পাটীগণিত পড়া চলিবে। কাজেই প্রতিদিন ৩০ মিনিটের বেশী সময় এই বিষয় দুইটির প্রত্যেকটির জন্য পাওয়া যাইবে না—এই কথা মনে রাখিয়া দৈনিক কতটুকু ও একমাসে মোট কত শেখান সম্ভব, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব প্রথমেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। নূতন বিধি-অনুযায়ী একটি পাঠক্রম নিম্নে দেওয়া গেল। বহু ক্ষেত্রে ইহা অনুসরণ করিয়া শিক্ষক মহাশয় পড়াইয়া এবং ছাত্র পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছে।

প্রথমে ০ হইতে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক একাধিক অঙ্কের যোগে ১০ হইতে সংখ্যা লেখা এবং ১৬ আনা পর্যন্ত ভগ্নাংশ লিখিবার পর বর্ণপরিচয় আরম্ভ হইবে।

পাঠক্রম	বর্ণপরিচয়
১	৸০ হইতে দ ব র লেখা, চেনা ও শব্দ-গঠন।
২	ব হইতে ক ধ ঝ ঐ
৩	া-কার-যোগে দা বা রা কা ঝা লেখা ও শব্দ গঠন।
৪	অনুশীলনী দ ব র ক ধ ঝ / দা বা রা কা ধা ঝা
৫	দাঁড়ি ও আঁকড়ি-যোগে ন ণ ম ল। শব্দ-গঠন।
৬	া-কাব-যোগে না ণা মা লা। শব্দ-গঠন।
৭	অনুশীলনী।
৮	২ হইতে য য় ষ।
৯	া-কার যোগে যা য়া ষা। অনুশীলনী।
১০	২ হইতে ফ খ ঘ।
১১	া-কার-যোগে ফা খা ঘা। অনুশীলনী।
১২	২ হইতে হ থ ; া-কার-যোগে হা থা। অনুশীলনী।
১৩	২ হইতে ই ; ইকার (ি)-যোগে দি, বি, কি, নি ইত্যাদি।
১৪	৶০ হইতে ঈ ; ঈকার (ী)-যোগে দী, বী, নী, লী ইত্যাদি।
১৫	ঋ ঋকার (ৃ)-যোগে কৃ, বৃ, ঘৃ, হৃ ইত্যাদি। অনুশীলনী।
১৬	৩ হইতে অ আ। অনুশীলনী।
১৭	৭ হইতে এ ; একার (ে)-যোগে দে, বে, খে, তে ইত্যাদি।
১৮	৩ হইতে ও ; ওকার (ো)-যোগে দো, বো, খো, তো ইত্যাদি। অনুশীলনী।
১৯	৩ হইতে ঔ, ঔকার (ৌ)-যোগে তৌ, দৌ, দৌ ইত্যাদি। অনুশীলনী।
২০	৬ হইতে ড ড় জ ভ ; আ-কারাদি-যোগে শব্দ-গঠন ও অনুশীলনী।
২১	৬ হইতে উ ; উ-কার (ু)-যোগে কু, লু, জু ইত্যাদি। শব্দ-গঠন ও অনুশীলনী।
২২	৬ হইতে ঊ ; ঊকার (ূ)-যোগে কূ, মূ ইত্যাদি। অনুশীলনী।
২৩	৬ হইতে ঙ ; আ-কারাদি-যোগে শব্দ-গঠন।
২৪	৭ হইতে ঐ ; ঐকার (ৈ)-যোগে শব্দ-গঠন।

২৫ ৭ হইতে ঞ ; া ও ি-কার-যোগে শব্দ-গঠন।
২৬ ৮ হইতে ঢ ঢ় ট ; আ-কারাদি-যোগে শব্দ-গঠন।
২৭ ৮ হইতে চ, ছ ; আ-কারাদি-যোগে শব্দ-গঠন।
২৮ ১ হইতে গ, প ; ঐ
২৯ ১ হইতে ঠ, গ, শ ; ঐ
৩০ ং, ঃ, ঁ, ৎ ও হসন্ত বর্ণের ব্যবহার লিখন-অভ্যাস।

যুক্তাক্ষর

পাঠক্রম দুই অক্ষরের যোগ

১ দ্বিত্ব সংযোগ
২ রেফ্ "
৩ য ফলা
৪ র "
৫ ব "
৬ ম "
৭ ন ণ ল "
৮ ঙ-র সহিত ক, খ, গ, ঘ-এর যোগ।
৯ ঞ-র সহিত চ ছ জ ঝ-এর যোগ।
১০ ণ-এর সহিত ট ঠ ড ঢ-এর যোগ।
১১ ন-এর সহিত ত থ দ ধ-এর যোগ।
১২ শ, ষ, স-এর সহিত অন্য বর্ণের যোগ।
১৩ ল-এর সহিত অন্য বর্ণের যোগ।
১৪ ক এবং প-এর সহিত ত-এর যোগ।
১৫ ম-এর সহিত প. ফ, ব, ভ-এর যোগ।
১৬ দ এবং ধ-এর সহিত অন্য বর্ণের যোগ।
১৭ চ-এর সহিত ছ, ড়-এর সহিত গ-এর যোগ।
১৮ ত-এর সহিত থ এবং হ-এর সহিত ম-এর যোগ।
১৯ তিন অক্ষরের যোগে শব্দ।

এইগুলি প্রয়োজনানুযায়ী আরও ছোট ছোট বিভাগ করিলে ৩০টি ও ২৫টি পাঠ হইবে। ইহার সহিত ২০টি সাধারণ পাঠ্য বিষয় থাকিলে মোট ৭৫টি; দিনে ৭৫টি পাঠ শেষ করিলে বয়স্করা রামায়ণ বা মহাভারত-পাঠের যোগ্যতা অর্জন করিবে।

পাটীগণিত

বয়স্কদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, সাধারণ অঙ্ক ও হিসাব জানা থাকিলে হাট-বাজার, মহাজন, জমিদারের কাছারি, পোস্ট-অফিস, রেলস্টেশন প্রভৃতি জায়গায় কেহ ঠকাইতে পারিবে না।

প্রসঙ্গচ্ছলে ভারতবর্ষই প্রথমে ০ হইতে ৯—এই কয়টি অঙ্ক এবং একাধিক অঙ্ক দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে—এই কথাটি বলা যাইতে পারে।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মাইবার জন্য কাঠি, তেঁতুলবিচি, ফুটবল, খুচরা পয়সা, তাস, ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বয়স্কদের অনেকেই কিছু কিছু গণিতে পারে। কে কতটা পারে, কে পড়িতে পারে বা কে লিখিতে পারে, জানিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা সংখ্যা পড়িতে বা লিখিতে পারে না, তাহাদের মধ্যেও গণনার হিসাব রাখার সঙ্কেত আছে, যথা—দাগ কাটা বা টালি (tally) দেওয়া। সংখ্যা-পঠন ও লিখনের প্রয়োজনীয়তা বড়দের এত বেশী যে, সহজেই তাহাদের শিখাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

১। সংখ্যা পড়া ও লেখা :

প্রথমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯-এর সঙ্গে পরিচয় করাইতে হইবে। একমাত্র শূন্যকে বিকৃত করিয়া বাকি প্রায় সকল অঙ্কই লেখা চলে। কার্ডে বড় অক্ষরে এক-একটি সংখ্যা লিখিয়া ঐরকম অনেকগুলি কার্ড রাখিলে সুবিধা হইবে। ১ লেখা কার্ড দেখাইয়া বোর্ডে চক্ দিয়া বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলে ও শিক্ষার্থীদেরও নিজ নিজ খাতায় বা শ্লেটে শিক্ষকের অনুকরণে ১ লিখিতে বলিলে তাহারা সহজেই ১ লিখিতে ও পড়িতে শিখিবে। ঐরূপে অন্যান্য সংখ্যাও লিখিবে।

কাঠি ও দশ দশ কাঠির বাণ্ডিলের সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার লিখনের প্রণালী সহজেই শেখান যায়। খুচরা টাকার নোট ও দশ টাকার নোটের সাহায্যে ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত লেখা ও পড়া শেখা যাইতে পারে। আসল টাকার নোটের স্থানে দশখানি ছোট ছোট এক টাকা-লেখা কার্ডও ব্যবহার করা যাইতে পারে, সংখ্যাব কার্ডগুলি পাশে পাশে সাজাইয়া বা বোর্ডে লিখিয়া পঠনের অভ্যাস করাইতে হইবে। এইরূপে দশখানি একশত টাকা লেখা কার্ড ব্যবহার করা সহজ হইবে।

২। যোগ-বিয়োগ।

যোগ—বড়দের অনেকেই যোগ-বিয়োগের সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যেমন, একজনেব মাসিক বেতন ৭৲ টাকা ছিল, এখন হইতে ২৲ বাড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহাব মাহিনা কত হইল? আগে ছিল ৮৲ এখন হইয়াছে ১১৲, কত বাড়িয়াছে? এইরূপ ছোট ছোট মৌখিক প্রশ্নের সাহায্যে দেখিতে হইবে শিক্ষার্থীদের কতটা জানা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে লিখিয়া দেখান উচিত:

$$\begin{array}{r} ৭ \\ +২ \\ \hline ৯ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ১১ \\ -৮ \\ \hline ৩ \end{array} \qquad \text{ইত্যাদি।}$$

কিভাবে শিক্ষার্থী এইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, হয় আঙ্গুলের 'কর' গণিয়া, না হয় সত্যি সত্যি পয়সা বা অন্য জিনিস গণিয়া অনেকে হিসাব করে। আঙ্গুলের 'কর' গণিয়া যোগের বা বিয়োগের কাজ করা যায়, কিন্তু যাহাতে 'কর' না গণিয়া দুইটি অঙ্কের সংখ্যা দেখিলেই তাহাদের যোগফল বা অন্তরফল বলিতে পারে (যেমন গুণনের বেলায়), ইহা শিখাইতে হইবে। ইহার জন্য যোগের নামতা জানা দরকার। যেমন—

$$\begin{array}{r} ১ \\ +১ \\ \hline ২ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ১ \\ +২ \\ \hline ৩ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ১ \\ +৩ \\ \hline ৪ \end{array}$$

ইত্যাদি। পড়িবে, এক আর এক **দুই**; এক আর দুয়ে **তিন**; এক আর তিনে **চার**; এই রকম।

৩। গুণ ও ভাগ-এর নামতা :

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নামতা তৈরি করিবে। তারপর বারবার পড়িয়া মুখস্থ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে প্রয়োগের সুযোগ। নামতা মুখস্থ করাইবার জন্য বেশী তাগিদ দিবার দরকার নাই ; সোজা সোজা যোগের অঙ্ক করিতেই অনেকটা মুখস্থ হইবে।

প্রথম হইতেই শিক্ষার্থীরা যেন খেয়াল করে :

$$\begin{array}{r} ৩ \\ +৫ \\ \hline ৮ \end{array} \quad \text{আবার} \quad \begin{array}{r} ৫ \\ +৩ \\ \hline ৮ \end{array}$$

আবার ৩+৫=৮, ৫+৩=৮। দুই ভাবেই লিখিয়া যোগ করার অভ্যাস দরকার।

বিয়োগ—বিয়োগেব নামতা আলাদা কয়িয়া শিখাইবাব দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। যোগের নামতাব সাহায্যেই বিয়োগেব কাজ চলিবে।

$$\begin{array}{r} ৮ \\ -৩ \\ \hline ৫ \end{array}$$

এই অঙ্ক ৩ আব কত হইলে ৮ হইবে—এই ভাবে দেখিলে যোগের নামতার সাহায্যেই ৫ পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ কড়ি গুণিতেও লোকে ৩-এর পর ৪ হইতে ৮ পর্যন্ত গণিয়া দেখে আর কত দরকার।

সহজ হইতে ক্রমে ক্রমে জটিল অঙ্কে যাইতে হইবে। প্রথম হইতেই অঙ্ক শুদ্ধ হইল কিনা, মিলাইয়া দেখিবার অভ্যাস করান দরকার। যোগ এবং বিয়োগ—উভয়প্রকার অঙ্কই মৌখিক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শিখান বিধেয়।

গুণন—গুণ যে যোগেরই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, ইহা সহজেই বুঝান যায়। যেমন—একজনের কাছে ৫ পয়সা আছে, আর একজনের কাছে তাহার ২ গুণ আছে ; দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট কত পয়সা আছে ?

$$\begin{array}{r} ৫ \\ +৫ \\ \hline ১০ \end{array} \Bigg\} \quad \begin{array}{r} ৫ \\ \text{ইহাই} \times ২ \\ \hline ১০ \end{array}$$

তেমনি ধানের দর ছিল ৪৲ মণ, এখন দর চারগুণ, এখন ধানের দর কত ?

$$\left.\begin{array}{r} ৪ \\ +৪ \\ +৪ \\ +৪ \\ \hline ১৬ \end{array}\right\} \quad \text{ইহাই} \quad \begin{array}{r} ৪ \\ \times ৪ \\ \hline ১৬ \end{array}$$

অর্থাৎ ৭কে ৪ দিয়া গুণ করিলে ১৬ হয়। গুণকের নামতার প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ প্রশ্ন দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায় ঃ

(ক) দৈনিক মজুরি ৲ হইলে ৭ দিনের মজুরি কত ?

অথবা ,

টাকায় ১৬ আনা, তিন টাকায় কয় আনা ?

যোগেব সাহায্যে গুণেব নামতা শেখান যায় এবং নামতা মুখস্থ হইলে সহজ হইতে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন অঙ্ক শেখান হইবে। শূন্যকে কিছু দিয়া গুণ করিলে যে শূন্যই হয়, সে বিষয়ে খেয়াল করাইতে হইবে।

ভাগ—গুণেব নামতা ঠিক হইলে ভাগেব কাজও শেখান যাইবে। ৩০৲ ৫ জনের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে কত পাইবে ? এক এক জনকে ৫৲ কবিয়া দিলে ২০৲ কয়জনকে দেওয়া যাইবে ? ২৫টা আম ৬ জনকে ভাগ করিয়া দিলে একজন কয়টা পাইবে ? ইত্যাদি প্রশ্নের সাহায্যে ভাগের কাজ বুঝান যায়।

প্রথমদিকে যথেষ্ট মৌখিক অঙ্ক দিতে হইবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকিতে পারে—ইহা সহজেই বুঝিবে। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের অঙ্ক তৈরি করিতে বলা উচিত। তাহারা বুঝিতে পারিবে ভাগের অঙ্কে দুইরকম জিনিসই আছে, যথা—এতটা টাকা, আম বা অন্য জিনিস এত জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে কত পাইবে, আবার প্রত্যেক ভাগে এতটা হইলে এতটা জিনিসে কয়টা ভাগ হইবে ?

ভাগ অঙ্ক কি করিয়া লিখিতে হয় দেখাইতে হইবে ঃ

৫) ৩০ টাকা (৬ টাকা   ৫টা) ২০টা (৪ জন

  ৩০   ২০

 ———   ———

দীর্ঘভাগ নিম্নলিখিত রূপে উদাহরণের সাহায্যে বুঝান যায় :—

```
      ৬                    ১৫
  ---------            ---------
  ৫ ) ৩ (              ২ ) ৩১ (
      ৩০                   ২
  ---------            ---------
                           ১১
                           ১০
                       ---------
                            ১
```

৩১—৩ দশ ও ১। ৩ দশকে দুই দিয়া ভাগ করিলে ১ দশ হয়। সুতরাং দশকের স্থানে ১ লেখা হইল, বাকী থাকে ১ দশ। ১ দশ ১=১১। ১১কে ২ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হয়, ৫ এককের ঘরে লেখা হইল। অবশিষ্ট থাকিল ১। সুতরাং ভাগফল হইল ১৫, অবশিষ্ট ১। এইরূপে ৩ অঙ্ক-বিশিষ্ট, পরে ৪ অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যা লইতে হইবে।

৪। মিশ্র যোগ, বিয়োগ ও ভাগ ঃ

এইগুলি শিখাইবার জন্য ধারাপাতের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। ইংরাজী প্রথায় এইগুলি শেখান অপেক্ষা ধারাপাতের বিধিতে শেখান সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য প্রয়োজন মাত্র ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনায় দক্ষতা। সাধারণ গ্রাম্য জীবনে গণনা-কার্যে গণ্ডা, পণ ও কাহনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। গ্রামবাসীরা এইগুলির ব্যবহারে এমনই অভ্যস্ত যে, অন্য কোন বিধি প্রচলিত করিতে গেলেই গ্রাম্য জীবনের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব চিরাচরিত ধারাপাতের সাহায্যে বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে মিশ্র যোগাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

মুদ্রা ও ওজন—এই দুইটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই সম্পর্কে ধারাপাতের 'কিয়া'গুলি ভাল করিয়া মুখে মুখে অভ্যাস করাইতে পারিলে সুবিধা হইবে। দিন-ক্ষণের অঙ্কের সাধারণ জীবনে খুব বেশী প্রয়োজন হয় না, নিখুঁত-ভাবে পাঁজি দেখিবার জন্য উহার প্রয়োজন হইতে পারে। ঘড়ি দেখা অভ্যাস করাইতে সেকেণ্ড, মিনিট ও ঘণ্টার প্রয়োজন হয়, এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ছোট ছোট অঙ্ক মুখে মুখে অভ্যাস করান উচিত। আজকাল যান্ত্রিকযুগে 'টাইম' ধরিয়া অনেক কাজই করিতে হয়। দিন, ঘণ্টা ইত্যাদি বিষয় শিখাইতে গিয়া দণ্ড, পল সম্পর্কে কিছু বুঝাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ঘণ্টার সহিত প্রহর ও দণ্ডের কি সম্পর্ক, তাহা জানা বিশেষ দরকার। পল্লীবাসীর জীবনে তিথির প্রভাব খুব বেশী এবং পূজা-পার্বণাদিতে তিথি, দণ্ড, পল আসিয়া পড়ে।

গজ, ফুট ও ইঞ্চির সূক্ষ্ম হিসাবের কতটুকুই বা সাধারণ গ্রাম্য জীবনে প্রয়োজন হয়। তবে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। সাধারণতঃ ক্রোশ, মাইল ও হাতের মাপে গ্রামবাসীদিগের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মিটিয়া যায়। ছুতার বা কামারদিগের অবশ্য সূক্ষ্ম মাপের প্রয়োজন হয়। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনমত অঙ্কগুলি শিখাইতে পারিলে গ্রাম্য কামার বা ছুতারের দক্ষতা বাড়িতে পারে।

বিঘা, কাঠা ও ছটাক দিয়া জমি মাপিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। এই মাপগুলি রৈখিক ও বর্গীয়—উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান আবশ্যক। এক একর-পরিমিত জমিকে ১০০ ভাগ করিলে প্রতি অংশকে শতক বলে এবং ৩৩ শতকে এক বিঘা হয়। এই সম্পর্কে একটি ধারাপাতের 'কিয়া' গড়িয়া লইয়া অভ্যাস করাইলে মন্দ হয় না।

৫। **বাজার-হিসাব ও জমা-খরচ:**

বাজার-হিসাব ও জমা-খরচ কিরূপে লিখিতে হয় এবং প্রত্যহ মিলাইতে হয় তাহা দেখাইয়া দেওয়া দরকার। হিসাব করিতে ও রাখিতে শিখিলে চাষীরা চাষের ফসলের পড়তা করিতে শিখিবে। এখন চাষীরা অনেক সময় পড়তা না করিয়াই ফসল-উৎপাদনে লাগিয়া যায় এবং উৎপাদিত ফসল বাজার-দরে বেচিয়া ঋণগ্রস্ত হয়। রীতিমত হিসাব রাখিবার অভ্যাস করিলে চাষে লোকসান হইবার সম্ভাবনা কমিবে এবং চাষী লাভজনক চাষে মনে দিবে।

দাঁড়ি-পাল্লার ব্যবহার সযত্নে শেখান প্রয়োজন। চতুর দোকানী কেমন করিয়া দাঁড়ি মারিয়া সকল ক্রেতাকে ঠকায়, পাষাণ কাহাকে বলে, কোন্ কোন্ কারণে পাষাণ হয় এবং কি কি উপায়ে পাষাণ সারিয়া নিখুঁত দাঁড়ি-পাল্লা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া দরকার। হাত-পাল্লা ও টাঙ্গানো কাঁটার সুবিধা-অসুবিধার বিষয় কিছু জানা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।

৬। **মৌখিক হিসাব ও শুভঙ্করী:**

মুখে মুখে হিসাব করিবার জন্য শুভঙ্করের কয়েকটি সূত্রের অভ্যাস ও প্রয়োগ শিক্ষা করা প্রয়োজন। সাত-আটটি সূত্র অভ্যাস করিলেই যথেষ্ট।

৭। **দশমিক হিসাব:**

দশমিক হিসাবের অতি সামান্য প্রয়োগ সাধারণ জীবনের কয়েক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। একককে দশ ভাগে ভাগ করিলে যে অংশগুলি পাওয়া

যায়, উহার ব্যবহার জ্বর দেখিবার জন্য থার্মোমিটারে দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী কাগজপত্রে জমির মাপ আজকাল সাধারণতঃ একক ও শতকে লিখিত থাকে। এক একরকে একশত ভাগে ভাগ করিলে একশত ডেসিম্যাল বা শতক হয়; ৩৩ শতকে আমাদের এক বিঘা ধরা হয়। এই দুইটি সূক্ষ্ম ভাগের ধারণা হওয়া সাধারণের উচিত।

পাটীগণিতের পাঠক্রম

পাঠক্রম : অঙ্ক

১। ০—৯ গণনা। শূন্য লেখা সহজ; আবার শূন্য হইতে ১, ২ ... ৯ অঙ্ক লেখা খুব সহজ

২। ১০—২০ গণনা। প্রথম অঙ্ককে দশ টাকার নোটের সংখ্যা এবং দ্বিতীয় অঙ্ককে খুচরা টাকার সংখ্যা ধরিলে সংখ্যা লেখা ও পড়া সহজ হইবে।

৩। **ভগ্নাংশ** ১ আনা ৴০
২ আনা ৵০
৩ আনা ৶০
৪ আনা ।০
৫ আনা ।৴০
৬ আনা ।৵০
৭ আনা ।৶
৮ আনা ॥০
৯ আনা ॥৴০
১০ আনা ॥৵০
১১ আনা ॥৶০
১২ আনা ৸০
১৩ আনা ৸৴০
১৪ আনা ৸৵০

ভগ্নাংশ ১৫ আনা ৸৶০
১৬ আনা ১৲

৪। জোড়া ও গণ্ডা ৫১

৫। পণ ও কাহন ১৲

৬। টাকা, আনা, পয়সা।

৭। ছটাক, সের, পশুরি, মণ।
৴৴০ ৴১ ৴৫ ১৴

৮। ২১—৪০ গণনা।
৩ ও ৪-এর নামতা।

৯। সের ও মণ।

১০। ৪১—৬০ গণনা।
৫ ও ৬-এর নামতা।

১১। ৬১—৮০ গণনা।
৭ ও ৮-এর নামতা।

১২। জমির মাপ; দৈর্ঘ্য ও বর্গ।

১৩। জমির মাপ; ছটাক।

১৪। জমির মাপ; কাঠা।

১৫। জমির মাপ; বিঘা।

১৬। ৮১—৯৯ গণনা।
৯ এর নামতা

১৭। ১০০—৯৯৯ গণনা।
১০ এর নামতা।

১৮। জমির মাপ; একর ও ডেসিম্যাল

১৯। ১২-র নামতা
শুভঙ্করীর কয়েকটি আর্যা।
২০। ১৬ ও ২০-র নামতা।
২১। সরল যোগ।
২২। সরল বিয়োগ।
২৩। সরল গুণ।
২৪। সরল ভাগ।
২৫। মিশ্র যোগ।
২৬। মিশ্র বিয়োগ।
২৭। মিশ্র গুণ।
২৮। মিশ্র ভাগ।
২৯। দৈনিক হিসাব রাখিবার রীতি।
৩০। মাসিক খতিয়ান।

[নয়া পয়সার হিসাবে অঙ্ক শিখাইতে হইবে]

সংস্কৃতি-বিষয়ক পাঠ্য (মৌখিক)

(ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল, (গ) সমাজ-বিজ্ঞান, (ঘ) স্বাস্থ্যবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, (ঙ) সহজ বিজ্ঞান, (চ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, (ছ) কৃষিকর্ম ও (জ) গ্রাম্য শিল্প (হাতে কলমে)।

মাতৃভাষায় লিখন-পঠন এবং পাটীগণিত ছাড়াও উপরিল্লিখিত বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের যুগে ইহা ছাড়া আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পরবর্তী শিক্ষার (Follow-on-edncation)-মারফত এই সকল বিষয়ের জ্ঞান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু আপাততঃ তিনমাস-কালের মধ্যে সাক্ষরতা লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয়ে বয়স্ক ব্যক্তির সামান্য কিছু জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। সুতরাং বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠ্য ও আলোচ্য বিষয়ের তালিকা অকারণ ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা উচিত নহে। সাক্ষরতা ও সাধারণ শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং সেই সুযোগে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের নানা বৈচিত্র্যের কথা জানিতে পারিবে। সেইজন্য ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের কোন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই—অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব বিষয়ে লেখা-পড়ার কোন কাজ থাকিবে না, যাহা কিছু সবই মৌখিক শিখাইতে হইবে।

ইতিহাস

গল্পচ্ছলে এবং মানচিত্র, ছবি ও নক্সা প্রভৃতির সাহায্যে ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। স্কুলের শ্রেণীতে সাধারণতঃ যেভাবে ইতিহাস পড়ানো হয়, অর্থাৎ পড়া দেওয়া ও পড়া লওয়া হয়—বয়স্কদের বেলায় এই প্রথার প্রয়োগ একেবারেই নিষিদ্ধ। ঐতিহাসিক গল্পের ভিতর দিয়া জাতির সামাজিক ও কৃষ্টিগত ভাবধারার ক্রমবিকাশের উপর আলো পাত করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব বর্তমানের সহিত অতীতের সম্পর্ক বুঝাইয়া দিতে হইবে। কতকগুলি সন, তারিখ, রাজা, উজীর ও যুদ্ধের নাম নেহাত অপ্রয়োজনীয়। এই প্রণালীতে যে যে বিষয় করা কঠিন, সেগুলিকে বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। ফিল্ম (Film), এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope) ও নাটকাভিনয়ের সাহায্যে ইতিহাস সরল ও প্রাণবান করিয়া তোলা হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার ও কাহিনীর তালিকা এখানে দেওয়া হইল। মোটামুটি এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের ও জাতির সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ইতিহাসের ধারার সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয়-সাধন করাইতে হইবে। মৌখিক পাঠদান প্রণালীর কোন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল না, দেওয়া সম্ভবও নহে। নমুনাস্বরূপ একটি আখ্যায়িকা পরে বিবৃত হইল।

ভারতবর্ষ :

১। প্রাচীন আদিবাসী ও দ্রাবিড় জাতি, আর্যগণের আগমন। বৈদিকযুগে জীবনযাত্রা ও সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান।

২। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী।

৩। বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ।

৪। মৌর্য-বংশ—চন্দ্রগুপ্তের কীর্তি, অশোক—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্।

৫। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস।

৬। মুসলমান-আক্রমণ ও ভারত-বিজয়; মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বীরাজ। শেরশাহ্, আকবর, শাহ্জাহান, ঔরঙ্গজীব। মোগল-সাম্রাজ্যের পতন। মারাঠা ও শিখশক্তির অভ্যুত্থান।

বাংলাদেশ ঃ

৭। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা। বিজয়সিংহের কাহিনী। পালবংশ ও কৈবর্ত-বিদ্রোহ। সেনবংশ ও বক্তিয়ার খিলজীর বাংলা-আক্রমণ।

৮। মোগল-যুগে বাংলা—বার ভুইঞা।

৯। নবাব আলিবর্দী ও বর্গীর হাঙ্গামা।

১০। সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশির যুদ্ধ।

১১। ইংরাজ-আমল ও আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম :

(ক) সিপাহী-বিদ্রোহ ১৮৫৭।

(খ) বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন—সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও অশ্বিনী দত্ত।

(গ) কংগ্রেস ও বিপ্লব-আন্দোলন—মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেহরু ও সুভাষচন্দ্র।

(ঘ) ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান।

সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ইতিহাস

১২। (ক) প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ—বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবন, ইসলাম।

(খ) শ্রীচৈতন্য—বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-কবিগণ।

(গ) রামপ্রসাদ ও শ্যামাসঙ্গীত।

(ঘ) রাজা রামমোহন রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

(ঙ) বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

গল্পের নমুনা

আদিবাসী ও দ্রাবিড় জাতির কথা

[মানচিত্র ও ছবির সাহায্যে]

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন, তা ঠিক করে বলা যায় না; পণ্ডিতেরা বলেন যে, এখন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে এক সভ্য জাতির বাস ছিল। কিন্তু তারও আগে যারা এদেশে বাস করত,

তাদের কথা বিশেষ কিছুই জানা নেই। তবে অনেক জায়গায় মাটির নীচে বা পাহাড়ের গুহায় পাথরের তৈরী নানা আকারের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে—এই-সব দেখে মনে হয় যে, খুব প্রাচীন কালে এমন একদল লোক ছিল, যারা জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের পাথরের টুকরা ব্যবহার করত, হয়ত এগুলো ছুঁড়ে শত্রু বা জন্তু-জানোয়ারকে জখম করত বা মেরে ফেলত। এইসব পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের আকার ও গঠন দেখেই এদের নির্মাণকারীরা যে অসভ্য ও অনুন্নত ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। আগুনের ব্যবহার বা চাষ-আবাদের কাজ কিছুই এদের জানা ছিল না। এরা গাছের ফলমূল ও জন্তু-জানোয়ারেব কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত। এইসব মানুষ আর পশুর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। ক্রমে ক্রমে মানুষের উন্নতি হতে থাকে ও তারা চাষবাস করতে এবং মাটির বাসনকোসন গড়তে শেখে। কিন্তু কোন ধাতু, যেমন—লোহা, তামা প্রভৃতি কিভাবে কাজে লাগান যায় তা জানত না। এরা ধান, পান, কলা ও নারকেলের চাষ করত; পাহাড়ের গা কেটে ক্ষেত প্রস্তুত করত। লাঙ্গলের মুখে কাঠের ফাল লাগাত। তীর-ধনুক এদের প্রধান অস্ত্র ছিল। আমাদের পূজাপার্বণে পান, ধান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারির ব্যবহার বোধ হয় সেই প্রাচীন সময় থেকে চলে আসছে। আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় এবং বিহার প্রদেশে কোল, মুণ্ডা ও সাঁওতাল-জাতীয় বহু লোকের বাস। অনেকে মনে করেন যে, এরাই সেই আগেকার যুগের বুনো মানুষের বংশধর। এবা অবশ্য এখন আর তত অসভ্য ও অনুন্নত নেই। ক্রমে ক্রমে লেখাপড়া শিখে ও অন্যের সংস্পর্শে এসে আজকাল উন্নত হচ্ছে।

এর বহুদিন পরে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদের তীরে এবং সিন্ধুপ্রদেশে এক খুব সভ্য জাতি বাস করতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। মাটি খুঁড়ে অতি প্রাচীন খুব বড় বড় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

[এস্থলে মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের চিত্র ফিল্ম অথবা এপিডায়াস্কোপের সাহায্যে দেখান একান্ত প্রয়োজন।]

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এখন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে এক অতি সভ্য জাতি ভারতবর্ষে বাস করত, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন ও সভ্য দেশগুলির (যথা—চীন, মিশর ও পশ্চিম এশিয়া) মধ্যে ভারতবর্ষও

একটি। এ যুগের লোকেরা বড় বড় পাকা দালান-কোঠার শহর নির্মাণ করে তার চার পাশে প্রাচীর তুলে সুরক্ষিত পুর বা দুর্গে বাস করত। পরে যখন আর্যেরা এদেশে আসেন তখন এদের সঙ্গেই প্রথম তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং পুরা জয় বা ধ্বংস করবার জন্যই বোধ হয় আর্যদের দেবতা ইন্দ্রের আর এক নাম হয় পুরন্দর।

সিন্ধুনদের তীর ও সিন্ধুদেশে যে সভ্য জাতি বাস করত, তারা সোনা, রূপা ও তামার ব্যবহার জানত। চীনা মাটির বাসন তৈরি করে তার উপর ফুল, লতাপাতা, পাখী ইত্যাদির সুন্দর ছবি আঁকত এবং নানারকম সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়ত; কিন্তু এরা লোহার ব্যবহার জানত না। এরা গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, উট, হাতী ও শূয়োর প্রভৃতি পশু পুষত। গম, খেজুর, ফল ও দুধ খেত। এরা শিব ও মাতৃকার পূজা করত। মরলে মৃত ব্যক্তিকে কখনও বা পোড়াত, কখনও বা কবর দিত। অনেকে বলেন যে, এই সব লোক ছিল দ্রাবিড় জাতীয়।

এখন মাদ্রাজ ও দক্ষিণভারতে যারা থাকে, তাদের প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির বংশধর বলা হয়। এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা নানা বিষয়ে খুব সভ্য ও উন্নত ছিল। আর্যেরা এদেশে আসলে পর দ্রাবিড়দের সঙ্গেই তাঁদের প্রথম যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় এবং দ্রাবিড়রা পরাজিত হয়ে উত্তর ভারত ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যায়। আর্যদের প্রাচীন পুস্তকে দ্রাবিড়দের দাস বা দস্যু বলা হয়েছে। রামায়ণে যে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর ও লঙ্কার রাক্ষসদের কথা আছে, তারা হয়ত বাস্তবিকই ঐরূপ অসভ্য ও বর্বর ছিল না, আসলে তারা ছিল সভ্য, তবে লোকে শত্রুর কখনও প্রশংসা করে না, তাই আর্য কবিগণ এদের ঐরূপ বর্ণনা করেছেন। দ্রাবিড়দের ভাষা ও সাহিত্য ছিল মার্জিত এবং জীবনধারণ-প্রণালী ছিল উন্নত।

ভূগোল

দিক্-পরিচয়—ভূগোল পড়াইবার কৌশল সম্পর্কে আমরা সামান্য কিছু আলোচনা ইতোপূর্বেই করিয়াছি। উহার পুনরাবৃত্তি এখানে অনাবশ্যক। প্রথমেই দিক সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের জ্ঞান অধিকাংশের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। ঈশান, নৈঋত, বায়ু ও অগ্নি—এই চারিটি কোণের সংবাদ কতক লোক রাখে এবং কতক লোক

রাখে না। ঊর্ধ্ব ও অধঃ লইয়া দশটি দিকের সহিত শিক্ষার্থীদিগের পরিচয় না থাকিলে প্রথমেই পরিচয় করান দরকার। দিনের বেলায় সূর্যকে ধরিয়া এবং রাত্রে ধ্রুব নক্ষত্রের সাহায্যে কেমন করিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই দুইটির অভাবে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে দিক্ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা জানিয়া রাখা দরকার। একটি ছোট দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র যোগাড় করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

রাত্রির আকাশ—ধ্রুব নক্ষত্রের সহিত পরিচয় করাইবার সময় নক্ষত্রগুলির মধ্যে সপ্তর্ষি, শিশুমার, কালপুরুষ, লুব্ধকাদি কয়েকটি অতি পরিচিত নক্ষত্র চিনাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের সূর্য দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র—ইহা বলিয়া দেওয়া কর্তব্য। মেঘহীন আঁধার রাত্রে ছায়াপথটি দেখাইয়া দিলে ভাল হয়। উল্কাপাত সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। সৌরমণ্ডলের গ্রহ ও উপগ্রহ সম্পর্কে সামান্য পরিচয় থাকা ভাল। গ্রহগুলির মধ্যে শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে সুযোগমত দেখাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। এইগুলির সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ই যথেষ্ট, কোনরূপ বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই।

সূর্য ও চন্দ্র—দিন ও রাত্রি কেমন করিয়া হয়? ষড়্‌ঋতুর মোটামুটি কারণ-বর্ণনাকালে আমাদের পৃথিবী কর্তৃক সূর্যকে বৎসরে একবারমাত্র পরিক্রমার বিষয়টি গল্প করিয়া বলিতে পারিলে মন্দ হয় না। এই সম্পর্কে আপেক্ষিক গতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা জন্মাইবার দরকার হইবে। চলন্ত ট্রেনে বসিয়া থাকিলে মনে হয়, মাঠের গাছগুলি উল্টামুখে ছুটিতেছে, ছুটন্ত মেঘের অন্তরালে চাঁদকে দেখিলে মনে হয়, চাঁদই যেন মেঘের উল্টা দিকে ছুটিতেছে। এইরূপ আপেক্ষিক গতির কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান উচিত। গ্রহণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রভেদ দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তিথিগুলি ও উহাদের সহিত জোয়ার-ভাটার সম্পর্ক কি, তাহা জানা দক্ষিণবঙ্গের নদীতটস্থ জনপদবাসীদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। নৌ-চলাচলের জন্যও জোয়ার-ভাটার সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার। এই বিষয় যতটা সম্ভব ছবি বা lantern slides-এর সাহায্যে বুঝান উচিত।

নক্সা-আঁকা—দিক্-পরিচয়ের পরে গ্রামের একখানি নক্সা বোর্ডে আঁকিবার চেষ্টা করা দরকার। স্কুল-বাড়িটিকে কেন্দ্র করিয়া রাস্তা, হাট, ষ্টেশন, ডাক্তারখানা, পোস্ট-অফিস, বড় বড় বাড়ী, পুষ্করিণী, দেবমন্দির, খেলার মাঠ

ইত্যাদি স্থানগুলিকে উক্ত নক্সায় চিহ্নিত করা উচিত। তাহার পর প্রতি পড়ুয়াকে আপনার ভিটার নক্সা আঁকিতে বলা উচিত। উহাতে পুকুর, খিড়কি, বাঁশঝাড়, গোয়াল, সারগাদা, রান্নাঘর, উঠান, দালান, তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। সেটেলমেণ্টের আঁকা নক্সা দেখিয়া আপন ক্ষেত-খামার, জমি চিনিয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন করা উচিত।

দেশের পরিচয়—গ্রামের পরে পঞ্চায়েত-এর পরিচয় জানা দরকার। কয়টি গ্রাম লইয়া আপন পঞ্চায়েত গঠিত, তাহা জানা উচিত। পঞ্চায়েতের মূল গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্য গ্রামগুলি আঁকিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়েতের রাস্তা, আফিস, থানা ইত্যাদির একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইলে ভাল হয়। তাহার পর এই রীতিতে থানা, মহকুমা, জেলা এবং অবশেষে সারা পশ্চিমবাংলার মানচিত্রের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মান দরকার।

ভারত ও জগৎ—ইহার পর মানচিত্র ও গ্লোব দেখাইয়া ভারত ও জগতের সহিত পরিচয় করান উচিত। খুব মোটামুটি জ্ঞান হইলেই হইল, খুঁটিনাটি বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রা—উষর মরুভূমির কোলে মানুষ নির্মম বেদুইন জাতির কথা, চিরতুষারাবৃত অঞ্চলে জাত ও প্রতিপালিত এস্কিমো জাতির অদ্ভুত জীবনযাত্রার ইতিহাস, জাপান ও অদ্ভুতকর্মা জাপানীদের আধুনিক জগতে অভূতপূর্ব উন্নতির কথা এবং অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডের অদ্ভুত জীবজন্তুর ও আদিম অধিবাসীর বিবরণ।

চীন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ইংলণ্ডের চাষবাসের কথা। কলিকাতা, লণ্ডন, প্যারিস বা নিউইয়র্কের কথা ছবি দেখাইয়া গল্প করা।

ভারতের কথা—ভারতের পুণ্যতোয়া নদনদী: গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী ও নর্মদা। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতমালার কথা। কলিকাতা, দিল্লী, কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, আজমীর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরা ইত্যাদি নগরীর গল্প করা। ভারতের ৫২ পীঠের গল্প মানচিত্র দেখাইয়া করিতে পারিলে আর পৃথকভাবে ভূগোল পড়াইবার আবশ্যক হইবে না।

মানুষের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব—কয়লা, কেরোসিন, তুলা, পাট ও ইস্পাতের গল্প। যানবাহনের বিবরণ, আকাশ, রেল, জল ও স্থলপথের কাহিনী বলিতে গিয়া বিমান, ট্রেন, স্টীমার ও মোটরগাড়ীর কথা

বলা ভাল। আপন অভিজ্ঞতা হইতে যদি কেহ কিছু বলিতে পারেন, তাঁহাকে সান্ধ্য বৈঠকে ডাকিয়া আনিয়া গল্প শুনিলে জ্ঞান ও আনন্দ দুইই লাভ হইবে।

স্বাস্থ্যবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

উৎকৃষ্ট ছবি ও চার্টের সাহায্যে শরীরের গঠন—বায়ুনল, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, পাকস্থলী, রক্তচলাচল প্রভৃতি বুঝাইয়া দিলে আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হইবে। আজকাল ফিল্ম ও ফিল্মস্ট্রিপের সাহায্যে শারীরবৃত্ত (Physiology) এবং শরীর (Anatomy) সম্বন্ধে খুব চিত্তাকর্ষক ছবি দেখাইবার নানারূপ সুবিধা আছে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ মানের যে-কোন একখানা অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে আলোচনা চলিতে পারে।

১। **মানব-দেহের গঠন**—Alimentary—পৌষ্টিক, Circulatory—রক্তসংবহক, Digestive—পাচক, Muscular—পৈশিক, Respiratory—শ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্রান্ত, Excretory—রেচন প্রভৃতি দেহযন্ত্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

২। **শরীরের পরিচর্যা**—চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, দাঁত, চুল ও হাত-পায়ের যত্নবিধান। নিয়মিত সময়ে স্নান, আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা ও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা।

মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের অপকারিতা।

পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানা, বাসনকোসন, গৃহস্থালির আসবাবপত্র প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা।

আহার্য ও পানীয় দ্রব্যের যত্ন ও সংরক্ষণ।

৩। **গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা**—বাসগৃহ ও তাহার চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। গৃহাভ্যন্তরে বায়ু-চলাচল ও আলো-প্রবেশের ব্যবস্থা। নিদ্রাকালে ঘরের জানালা খুলিয়া রাখা।

গৃহনির্মাণ-প্রণালী—পাকের ঘর, পানীয় জলের কুয়া বা টিউবওয়েল, গোশালা, মলমূত্রাগার ও জলনিকাশের ব্যবস্থা।

৪। **পাড়া বা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা**—কুয়া, পুষ্করিণী, নর্দমা ও রাস্তা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার। হাট-বাজার প্রভৃতি স্থানের পরিচ্ছন্নতা। সাধারণের মলমূত্রাগার। আবর্জনা, গোময় ও মলমূত্র ইত্যাদির অপসারণ-ব্যবস্থা। জলনিকাশের ব্যবস্থা। ডোবা ও জঙ্গল।

৫। **ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধি এবং মারী রোগ**—প্রতিকার ও প্রতিষেধ-ব্যবস্থা। জলবসন্ত, হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কফ ইত্যাদি।

বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। রোগ-জীবাণু ও রোগ-সংক্রমণ। টিকা ও ইন্‌জেক্‌শনের প্রয়োজনীয়তা। ভোজ, উৎসব, মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে সতর্কতা-অবলম্বন।

মাছি, মশা, ছারপোকা, আরশোলা-ইঁদুর ইত্যাদির উৎপাত ও অপকারিতা নিবারণের উপায়।

৬। গৃহ-চিকিৎসা ও প্রাথমিক শুশ্রূষা।

কৃষিকর্ম

১। **কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয়তা**—বিভিন্ন শাখা, যথা—শস্য ও ফলের চাষ, পশুপালন, পক্ষিপালন ইত্যাদি।

২। **চারাগাছ ও বৃক্ষ**—মূল, পাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল ও বীজের বিবরণ।

৩। **জমি**—বিভিন্ন প্রকারের জমি, চাষের প্রণালী, বীজবপন।

৪। **জমির প্রকৃতি**—মাটির মোটামুটি উপাদান, আটাল আংশ, বালির অংশ এবং উদ্ভিদের রূপান্তরিত ধ্বংসাবশেষ বা হিউমাস। এই তিনটি উপাদানের নানা অনুপাতে মিশ্রণের ফলে নানা প্রকৃতির এঁটেল, বেলে, দো-আঁশ, বেলে-দো-আঁশ ইত্যাদি মাটির উৎপত্তি। মাটির রং দেখিয়া গুণাগুণ-বিচার। মাটির সংস্কারসাধন। কোন্ মাটিতে কিরূপ ফসল হওয়া সম্ভব। সুস্থ মাটির লক্ষণ, মাটির রোগ ও তাহার প্রতিকার। মাটির প্রাণ বা সার। উদ্ভিদের খাদ্য-গ্রহণে জলের প্রভাব।

৫। **চাষের যন্ত্রপাতি**—বিভিন্ন রকমের লাঙ্গল, তাহাদের ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধা। আধুনিক যন্ত্রপাতি,—ভারত ও অন্যান্য দেশে চাষ-আবাদের বিভিন্ন প্রণালী।

৬। **জলসেচ**—বিভিন্ন উপায় ও প্রয়োজনীয়তা।

৭। **সার ও জমির উৎপাদনী শক্তি**—পালাক্রমে চাষ।

৮। **বিভিন্নজাতীয় শস্য**—(ক) খাদ্যশস্য, যথা—ধান, গম, ইক্ষু, রবিশস্য ইত্যাদি। (খ) পাট, তুলা, শণ ইত্যাদি। (গ) গরুর ঘাস, বাঁশ, খড়, উলুখড়, বেত ইত্যাদি। (ঘ) তামাক, চা ইত্যাদি।

আগাছা ও জঙ্গল-নিয়ন্ত্রণের উপায়।

বিরাট্‌ সৃষ্টি-শৃঙ্খলায় একের পরিত্যক্ত আবর্জনা বা মল অন্যের খাদ্য—এই সূত্রটি লক্ষ্য করা উচিত। অখণ্ড দৃষ্টিতে অপরিষ্কার মল বলিয়া কিছুই নাই; একের মল অন্যের আহার্য, এই ব্যবস্থায় কোথাও অপচয় ঘটিবার সুযোগ নাই, তাই প্রকৃতিতে কোনও অভাব নাই; প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণা। খণ্ড দৃষ্টিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অক্সিজেন-বিনিময়, উদ্ভিদের নিকট প্রাণীর ঋণ এবং প্রাণীর নিকট উদ্ভিদের ঋণ।

সহজ বিজ্ঞান

সূচনা—পদার্থের তিন অবস্থা: কঠিন, তরল ও বায়বীয়। বায়ু ও জলের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম; বহমানতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব-অনুযায়ী স্তরবিন্যাস, আকারহীনতা—পাত্রানুযায়ী বা চাপ-অনুযায়ী আকার-গ্রহণ, লঘুত্ব-অনুযায়ী লঘুর মধ্যে অনুপ্রবেশ—বায়ুর জলে এবং জলের কঠিন পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবেশের ফলে সর্বত্র জীবের উৎপত্তি ও বাস সম্ভব হইয়াছে।

[*বয়স্কদিগকে বিজ্ঞান পড়াইবার সময় একটু অখণ্ডভাবে পড়াইতে পারিলেই ভাল হয়। স্কুল বা কলেজে যেরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঠ দিবার ব্যবস্থা আছে, ঐরূপ ভাবে না পড়াইয়া একই সূত্রের নানা অবস্থার প্রয়োগে যে একই ফল হয়, তাহার উপর জোর দেওয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ বায়ুর প্রাণপোষকতা দেখাইবার সময়ে সর্বত্র বায়ুর অনুপ্রবেশের ফলে প্রাণের লীলা সর্বত্রই দৃষ্টিতে পড়ে।

সর্বত্র যে প্রাণের লীলা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা-কালে আমাদের প্রাচীনদিগের পঞ্চভূতের বিষয় কিছু বলা দরকার। প্রাণের লীলার জন্য প্রয়োজন মাটি, জল, বায়ু, সৌরতেজ এবং এইগুলির চলাচলের জন্য শূন্য বা আকাশ। আকাশ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু জলে এবং জল মাটিতে অনুপ্রবেশ করে বলিয়া সর্বত্র জীবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চভূতের সম্পর্ক কি এবং উহাদিগের বিষয়গুলি (objects)—গন্ধ, আস্বাদ, স্পর্শ, রূপ ও শব্দ সম্পর্কে কিছু বলিতে পারিলে বয়স্কদিগের ভালই লাগিবে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চার রীতিকে একেবারে বাদ না দেওয়াই উচিত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান পড়াইতে গেলেই যন্ত্রের প্রয়োজন। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যন্ত্রের আশা বর্তমানে ত্যাগ

করিয়া যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রচারের চেষ্টা করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।]

তাপের ফলাফল—তাপে আয়তন বৃদ্ধি; দুইখণ্ড রেল লাইনের জোড়ার মুখে ফাঁক। তাপ-চলাচলের তিনটি রীতি: সংস্পর্শ, বিকিরণ এবং তপ্ত বস্তুকে শীতল বস্তুর নিকটে আনয়ন। তাপমাত্রার পরিমাণ-নির্ধারণ, ডিগ্রী, জলের জমাট বাঁধা ও স্ফুটন; স্টীম ইঞ্জিন।

বায়ুতে জলীয় বাষ্প—শিশির, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। বায়ু-চলাচল। দক্ষিণা বায়ু, ঝড়-ঝঞ্ঝা—উপকারিতা ও অপকারিতা।

সৌর তেজ—সর্বশক্তির মূলে সৌর তেজ। সঞ্চিত তেজ—কয়লা; ক্রিয়মান তেজ-বিকীর্ণ তাপাদি; শক্তির রূপান্তর; তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, আলো, শব্দ, পরমাণু-জাত শক্তি—একই সৌর তেজের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র।

তড়িৎ ও চুম্বক—তড়িতের আবিষ্কার, তড়িতের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম, চুম্বকের ধর্ম, চুম্বক-প্রস্তুত-প্রণালী; তড়িতের সহিত চুম্বকের সম্পর্ক। কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, টেলিগ্রাফ যন্ত্র।

কয়েকটি সাধারণ যন্ত্রের ব্যবহার—আনত তল (inclined plane), লিভার, কপি-কল, দাঁড়ি-পাল্লা।

মিশ্রণ ও মিলন—সাধারণ মিশ্রণ। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ। পার্থক্য।

দহন—বায়ুব উপাদান। লোহায় মরিচা কেন ধরে? অগ্নির উর্ধ্বগতি—বায়ুর সহিত অগ্নির মৈত্রীভাব। কাপড়ে আগুন লাগিলে আমাদের কি করা উচিত। জীবের অন্ন-পরিপাক দহনের নামান্তর মাত্র

গ্রাম্য জীবনে শিল্পের ব্যবহার ও শিক্ষা

কর্মক্লান্ত ও নানা অভাবে পীড়িত সাধারণ চাষীকে আপন উন্নতির জন্য নিয়মিত একটি স্থানে আনিবার উপায়স্বরূপ কতকগুলি শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না। চাষী যদি দেখে যে, রথ দেখার অবসরে কলা বেচিবার সুযোগ আছে, তাহা হইলে ডাকিয়া আনিবার জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ করিতে হইবে না।

গ্রাম্য জীবনে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলির মধ্যে যেগুলির অভাব, প্রথমতঃ সেইগুলির প্রস্তুত-প্রণালী হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তাহার পর জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিবার জন্য সাধারণতঃ যে-জিনিস-গুলির প্রয়োজন ঘটে, সেইগুলির মধ্যে যেগুলি গ্রামে প্রাপ্ত উৎপাদনে প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব, সেইগুলি প্রস্তুত করিবার উপায় শিখাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

প্রথমতঃ ধরা যাক বাঁশ। ইহা গ্রামে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামবাসীরই ভিটার সহিত একটা বাঁশঝাড় থাকে। বাঁশ হইতে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যই প্রস্তুত করা চলে। গরীব গ্রামবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রা বাঁশ ছাড়া একেবারেই চলে না। বাঁশঝাড়ের সংরক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রথম প্রয়োজন। তাহার পর বাঁশকে ঘুণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জলে পচান ও আলকাতরা মাখাইবার কথা আলোচনা হওয়া দরকার। একথা অনেকেই জানেন, আবার অনেকেই জানেন না বা আলস্যবশতঃ করেন না।

বাঁশ হইতে মজবুত ঝুড়ি, ডালা, কুলো, ধুচুনি, দরমা, জাফরি ইত্যাদি বহু দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখাইলে চাষীর প্রকৃত উপকার করা হইবে।

সাধারণতঃ জাতিবিশেষ এই কাজগুলি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। কিন্তু সকল গ্রামেই এগুলি প্রস্তুতের লোক বাস করে না, সেইজন্য বহু গ্রামবাসীকে এগুলির অভাবে সময়ে সময়ে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। কুটির-শিল্প হিসাবে এইগুলি প্রত্যেক চাষীর শেখা উচিত।

বাঁশ জলে কিছুদিন পচাইয়া লইলে সহজে বাঁশে ঘুণ ধরে না। এইরূপ পচানো বাঁশ আকারমত কাটিয়া, কাঁটা মারিয়া বেঞ্চ, র‍্যাক, টেবিল, টুল, খাট ইত্যাদি গৃহস্থের বহু আসবাব তৈয়ারী হইতে পারে। এই উপায়ে কুটীর-বাসীদিগের জীবনের মান উন্নততর করা সম্ভব।

তাহার পর গ্রামবাসীর প্রয়োজন দড়ি। আমাদের দেশে পাট, শণ ইত্যাদি দড়ির খুব ভাল উপাদান জন্মে। পুরাতন প্রথায় একা একা বসিয়া দড়ি পাকান অপেক্ষা দুই জনে অতি সামান্য যন্ত্র-সাহায্যে নূতন কৌশলে দড়ি পাকাইতে পারিলে অল্প সময়ে অনেক দড়ি পাকাইতে পারা যায়। এই কাজগুলি এমনই সহজসাধ্য যে, অল্পবয়স্ক বালকেরাই ইহা অনায়াসে করিতে পারে। বর্ষার দিনে বা অন্য সময়ে হাতে কোন কাজ না থাকিলে, বাড়িতে বাড়িতে এইরূপ দড়ি প্রস্তুত হইলে, গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দড়ি বেচিয়া গ্রামবাসীর আয়ের একটা নূতন পথ হইতে পারে।

দড়ি দিয়া পশ্চিম ভারতের মত খাট বুনাইতে শিখাইলে অর্থোপার্জন না

হোক, বাঁশের ফ্রেম দড়ি দিয়া ছাইয়া বসিবার মাচিয়া বা নীচু চৌকি ও শুইবার সুন্দর খাট প্রস্তুত হইতে পারে। পশ্চিম দেশের অধিকাংশ চাষী দড়ির খাট বুনিবার কৌশল জানে। তাহারা গাছ কাটিয়া চারিটি পায়া ও বাঁশ দিয়া ফ্রেমটি প্রস্তুত করিয়া লয়; তাহার পর ঘাস কাটিয়া আনিয়া দড়ি পাকাইয়া ফেলে এবং উহা দিয়া খাটটিকে ছাইয়া লয়। এইরূপে তাহারা মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের পরিবর্তে শুইবার বা বসিবার মত একখানি খাট লাভ করে। আমাদের দেশের আবহাওয়া গরম। দেশবাসী গরীব, তাই পাতিবার জন্য মাদুর বা কাঁথা ছাড়া আর কিছু জুটে না। প্রত্যেকের জন্য একখানি দড়ির খাট করিয়া লইলে মন্দ হয় না, সাপ ও বিছার কামড়ের ভয় থাকে না এবং বর্ষাকালে বা শীতকালে ভিজা মাটির মেঝেতে শুইয়া ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ও থাকে না।

জাল, থলে, চট ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দড়ি দিয়া বুনিয়া প্রস্তুত হয়। পাটদড়ির শতরঞ্চি বা আসন বুনিয়া লইলে ভালই হয়। পাট বা শণজাত শিল্পকে কুটীর-শিল্পে পরিণত করা খুব সহজ।

নারিকেল গাছের ফল হইতে আরম্ভ করিয়া পাতা পর্যন্ত তাহার প্রতিটি অংশ আমাদের অশেষ কাজে লাগে। জানা থাকিলে অনেকগুলি কুটীর-শিল্পের উপাদান ইহা হইতে পাওয়া সম্ভব।

কুশাসন প্রস্তুত করা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। খেজুর-পাতা বুনিয়া পাতিবার চাটাই, রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য টুপি ইত্যাদি চাষী গৃহস্থের বহুপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাল-পাতার পাখা তৈয়ারি করিতে শিখিলে আয়ের আর একটি পথ হয়।

যেখানে প্রচুর বেত পাওয়া যায়, সেখানে বেতের ঝুড়ি, আসন, চাটাই, ধামা, চেয়ার, বাক্স ইত্যাদি জিনিসগুলি প্রস্তুত করিতে শেখান উচিত। বাজার হইতে বেত কিনিয়া বেচিলে লাভও হয়।

মাদুর-কাঠির চাষ যে স্থানে সম্ভব, সেই অঞ্চলে মাদুর বুনিতে শেখান দরকার। মাদুর বুনিয়া গ্রামের চাহিদা মিটাইয়াও চালান দিতে পারা যায়। মাদুর-কাঠি কিনিয়াও ইহাকে একটি লাভজনক কুটীর-শিল্পে পরিণত করা অতি সহজ।

ঝিনুক, নারিকেলের মালা, বাঁশ, টুকরা টিন ইত্যাদি হইতে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে বেশ ভাল বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। শাঁখের আংটি, গলার

মালা, হাতে পরিবার নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত কুটির-শিল্পেরই অন্তর্গত। যে-গ্রামে কোনপ্রকার তৈল (নারিকেল, তিল, বাদাম ইত্যাদি) সুপ্রাপ্য, সে গ্রামে কাপড়-কাচা সাবান কুটীরে অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে এবং নিকটস্থ নগরে বিক্রয়ের জন্য পাঠান যাইতে পারে। কাপড়-কাচা সাবান প্রস্তুত করা শিক্ষা করিতে দুই মাস সময়ই যথেষ্ট।

কুটীর-শিল্পের জন্য জাপান বিখ্যাত। তাহাদের এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-জাত রীতি-নীতি আমাদের দেশে চালাইতে পারিলে এই গরীব দেশের অনেক অভাব ঘুচিবে। অল্প মূলধনে কি করিয়া এক-একটি কুটীর-শিল্পের পরিচালনা সম্ভবপর, তাহার শিক্ষা আমাদের গরীব গ্রামবাসীদিগকে দিতে পারিলে, অচিরেই গ্রামের প্রভূত আর্থিক উন্নতি দেখা দিবে। জাপানে এক বাঁশ হইতেই চৌদ্দশত বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এ-বিষয়ে জাপানীদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অত্যাশ্চর্য বলিলেও চলে। বাঁশের রঙিন বোতাম, জুতা, পেরেক, পর্দা, এমন কি মেয়েদের অতি শৌখীন ব্যাগ পর্যন্ত জাপানী গ্রামবাসীরা প্রস্তুত করে এবং আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশেও চালান দিয়া বহু অর্থ উপার্জন করে। কুটীর-শিল্পে বাঁশ হইতে কেমন করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার পথ খাদি-প্রতিষ্ঠান আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জাপানীরা কলে প্রস্তুত কাপড় বিদেশে চালান দেয়, নিজেরা কিন্তু কুটীর-শিল্পজাত বস্ত্র ব্যবহার করে। জাপানে এক-একটি শিল্প শিখাইতে দুইমাস সময় লাগে। আমাদের দেশে বয়স্কদিগের লেখাপড়া, হিসাবাদি আক্ষরিক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ের মধ্যে এক-একটি কুটীর-শিল্প শেখান অনায়াসেই সম্ভব।

পৌর-বিজ্ঞান

১। **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা**—গ্রাম-পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি—ইহাদের প্রত্যেকটির গঠনতন্ত্র ও কার্যপ্রণালী স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। গ্রাম, মহকুমা ও জেলা; প্রাদেশিক শাসন-কার্যের সুবিধার্থে বিভাগগুলির মোটামুটি বিবরণ।

২। **সাধারণ প্রশাসন-ব্যবস্থা**—(ক) রাজ্য বিধানসভা ও বিধানপরিষদ, (খ) কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা, (গ) বিচার-ব্যবস্থা : দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, জুরীপ্রথা, দেশে শান্তিরক্ষার জন্য গ্রাম্য চৌকিদার-প্রথা ও পুলিশী ব্যবস্থা এবং দেশরক্ষার জন্য জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর ব্যবস্থা।

৩। **জনসাধারণ**—(ক) জনসংখ্যা, জাতিবিভাগ, অস্পৃশ্যতা ও সমাজে নারীর স্থান, (খ) ভারতের নানা ভাষা ও লিপির মোটামুটি পরিচয়, একটি সাধারণ ভাষার (Lingua Franca) প্রয়োজনীয়তা, (গ) ভারতের ধর্ম, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে উদারতার প্রয়োজনীয়তা।

৪। **দেশের সম্পদ**—(ক) কৃষিজাত ও বনজ ফসল ; খনিজ ও শিল্পজাত সম্পদ, (খ) অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতের একটি রাজ্যের অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীলতা, নানা খাতে রাজস্ব আদায় ও ব্যয় ; আয়-ব্যয়ের একটা নমুনার পরিচয়, (গ) গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা।

৫। **ব্যক্তি ও রাষ্ট্র**—(ক) প্রজার জন্য রাষ্ট্র কি করে, (খ) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-নীতি ও প্রয়োগ-বিধি, (গ) রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য,—রাষ্ট্রানুগত্য ও রাষ্ট্রবিধি পালনে অবিচলিত নিষ্ঠা।

৬। **প্রজার ব্যক্তিগত অধিকার**—(ক) নির্ভয়ে বাস করিবার অধিকার, (খ) জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা খাটিয়া পাইবার অধিকার, (গ) আপন আপন বিবেকানুযায়ী নির্বিঘ্নে ধর্ম-পালনের অধিকার, (ঘ) স্বাধীন মত-প্রকাশের অধিকার।

৭। **ভারতের সংবিধান**—মোটামুটি বিবরণ।

অধিকাংশ স্থলেই মানচিত্র বা চার্টের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে এবং বিবরণগুলি খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়া দরকার

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

১। **বাসগৃহ ও উহার চারিপাশ**—(ক) বাসগৃহের চারিপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা বাসগৃহ হইতে দূরে লইয়া গিয়া সার-গাদায় ফেলা, (খ) বাসগৃহের সংলগ্ন পিছনের জমিতে ছোট একটি সব্জিবাগান এবং সম্ভব হইলে সম্মুখে একটি ফুলবাগান করা যাইতে পারে। সব্জিবাগানে লাউ, শসা, কুমড়া, সিম, বেগুন, লঙ্কা, উচ্ছে, করলা ইত্যাদি গাছ লাগাইতে পারা যায় এবং ফুলবাগানে গাঁদা, জবা, দোপাটি, বেল ইত্যাদি ফুলগাছ লাগাইতে পারা যায়। (গ) বাসগৃহের মধ্যে একটি মাঝারি ধরনের উঠান থাকা দরকার। ঘরের কোলে উভয় দিকে দালান থাকা উচিত। গৃহস্থালির তৈজসপত্রাদি বেশ ভাল করিয়া মাজিয়া সাজাইয়া রাখিবার অভ্যাস করা দরকার। ঘরগুলি লেপিয়া-নিকাইয়া (মাটির হইলে) বা ধুইয়া-মুছিয়া (পাকা বাড়ী হইলে)

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্যকর। হাতে প্রস্তুত বিছানা-ঢাকা বা চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি কেমন করিয়া তৈরি করিতে হয় তাহা শেখা দরকার।

২। **খাদ্য ও পাকপ্রণালী**—পুষ্টিকর ও সহজপ্রাচ্য খাদ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা, কলা, ছোলা ও মুগ, নারিকেল গুড়, পলাণ্ডু, বিলাতী বেগুন বা টম্যাটো ইত্যাদির বিবরণ। পাকপাত্র ও খাদ্য কেমন করিয়া পরিষ্কার রাখা যায়; পিপীলিকা ও মাছির উপদ্রব এবং ধুলা ও আবর্জনা হইতে খাদ্য বাঁচাইবার উপায়। ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে ধারণা এবং ভেজাল ধরিবার উপায়। বাসী ও পচা খাদ্য-গ্রহণের অপকারিতা।

৩। **জামা ও কাপড়**—কাপড় ও জামা সাবান দিয়া কাচিবার প্রণালী, মাড় ও নীল দিয়া শুকাইয়া ইস্ত্রি করা। **সেলাই**—ফতুয়া, সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ, ফ্রক, পায়জামা ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য বস্ত্রাদি। **বোনা**—গরম সোয়েটার, মোজা, গলাবন্ধ ইত্যাদি।

৪। **সেবা**—সাধারণ রোগে (জ্বর, পেটের অসুখ, আমাশয়, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি) সেবা।

(ক) রোগীর পথ্য প্রস্তুতকরণ: সাগু, বার্লি, ঘোল, ছানার জল, পোরের ভাত, মাছের ঝোল, মাংসের সুপ ইত্যাদি।

(খ) ক্যালসিয়াম, আদা, জোয়ান, নিমতেল, টিংচার আইওডিন, বোরিক অ্যাসিড ইত্যাদির ব্যবহার।

(গ) সেক দিবার (fomentation) নানা রীতি: শুকনা গরম, ভিজা গরম। রোগীকে বাতাস করিবার রীতি। জলপটি দিবার বিধি।

(ঘ) ফুলো কমাইবার ব্যবস্থা। সাধারণ লতাপাতার ব্যবহার।

(ঙ) প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid); রক্ত থামান, পটি বাঁধা, বিছা বা সাপের কামড়ে ও জলে ডুবিলে আশু কর্তব্য। গৃহপালিত সাধারণ পশুর রোগের চিকিৎসা। হঠাৎ কেহ মূর্ছিত হইলে এবং পাগলা শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে কি করা প্রয়োজন।

সূচী